Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে পিতা মাতার করণীয় ও দায়িত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া আফরিন সুপ্তি

রোলঃ 228020417

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে পিতা মাতার করণীয় ও দায়িত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া আফরিন সুপ্তি

রোলঃ 228020417

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে পিতা মাতার করণীয় ও দায়িত্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাদিয়া আফরিন সুপ্তি, আইডিঃ 228020417 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে পিতা মাতার করণীয় ও দায়িত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

সাদিয়া

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সাদিয়া আফরিন সুপ্তি

আইডিঃ 228020417

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 7

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তান-প্রীতি: 11

পিতামাতা সৎ হলে সন্তানও সৎ হয়:...13

নেককার জীবনসঙ্গী নির্বাচন করা: 15

সহবাসের পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ করা:...16

নেককার সন্তান লাভের জন্য দোয়া করা: 18

গর্ভাবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি গুরুত্ব দান:..20

ভূমিষ্ঠ সন্তানের জন্য শাইতান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা:...21

শিশুর জন্মলগ্নে ইসলামি রীতিনীতি: 22

কন্যা সন্তান আল্লাহর রহমত: 27

শিশুমনে আকীদা বদ্ধমূল করার গুরুত্ব:..30

শিশুবয়সে ঈমানি পরিচর্যা পেয়ে বড় হয়েছেন যারা:...33

প্রথম দুই বছর...35

এক বোন ও তার সন্তানদের গল্প 37

উত্তম নমুনা...38

সকাল-সন্ধ্যা শাইতান থেকে আশ্রয় চাওয়া:..41

আল-আযকার বা দু'আ 42

আরোগ্য লাভের দু'আ:...44

আযান শ্রবণের পর দু'আ:...45

শিশুকে তাওহিদ শিক্ষা দেয়া: 47

শৈশবকাল: দুই বছর থেকে ছয় বছর পর্যন্ত..50

সন্তানদেরকে বদ-দু'আ দেয়া যাবে না..51

সন্তানদেরকে দু'আ শিক্ষা দেয়া...52

আল্লাহ তাআলার বিরাজমানতা অন্তরে সৃষ্টি করা:..55
তাওহীদ শিক্ষা দেয়া: 58
প্রথমে ঈমান শিখানোর প্রতি গুরুত্ব দেয়া:...61
শিশু বয়সেই কুরআন মুখস্থ করিয়ে দেয়া:...63
ঘুমের পূর্বে শিক্ষণীয় গল্প শোনানো: 66
অপ্রীতিকর কোনো কিছু ঘটার সময়: 67
অসৎ লোকের সংশ্রব থেকে বিরত থাকা...68
নেককার আহলে ইলমের সাহচর্য গ্রহণ করা..69
সুরক্ষা থাকার দু'আ শিখানো:...70
সন্তানকে গান বাজনা থেকে দূরে রাখা:...71
হাদীসের আলোয় সাহাবীদের জীবন...72
চার ইমামের ভাষ্য :...73
শিশুকে ইন্টারনেট থেকে দূরে রাখা: 75
রাগ হলে কি করবেন?...76
বাবা-মা'র কোন আচরণগুলো গ্রহণযোগ্য নয়?...77
বাবা-মায়ের সঠিক দিকনির্দেশনা না পেলে কি হয়? 78
সঠিকভাবে সন্তান পালনের উপায়:...79
কাজের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস অর্জন: 80
মন্তব্য করার ক্ষেত্রে সংযমী হওয়া:..82
চাইলেই সবকিছু পাওয়া যায় না: 84
লোকমান হাকিমের উপদেশ:...84
হাত্তান ইবনু মুয়াল্লার নাসিহা: 87

ভূমিকা

সন্তান আল্লাহর দান। আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় এক আমানত। আল্লাহ এর মাধ্যমে পরীক্ষা করেন বান্দা এই আমানতের যথাযথ হেফাযত করে কি না। সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দুইভাবে পরীক্ষা করেন। এক. সন্তানের কারণে বান্দা আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে কি না। দুই. বান্দা সন্তানকে আমানত মনে করে কি না এবং সে আমানতের হেফাযতে যত্নবান হয় কি না। আল্লাহ তাআলা বলেন

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَّ اَنَّ اللهَ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

জেনে রেখ, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা। আর মহা পুরস্কার রয়েছে আল্লাহরই কাছে। সূরা আনফাল : ২৮

ইমাম ইবনে জারীর তবারী রাহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদের লক্ষ্য করে বলছেন:

واعلموا، أيها المؤمنون! إنما أموالكم التي خَوَّلَكُمُوها اللهُ، وأولادُكم التي وَهَبَها اللهُ لكم، اختبارٌ وبلاء، أَعْطاكُمُوها ليَختبرَكم بها ويَبتليَكم، لينظر كيف أنتم عاملون من أداء حق الله عليكم فيها، والانتهاء إلى أمره ونهيه فيها.

হে মুমিনগণ! জেনে রেখ, তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দান করেছি এসব তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু। এর মাধ্যমে তোমাদের আমি পরীক্ষা করব। এটা দেখার জন্য যে, সন্তান-সন্ততি ও অর্থ-কড়ির ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহর হক কতটুকু আদায় কর এবং দ্বীনের বিধিনিষেধ কী পরিমাণ মান্য কর। তাফসীরে তাবারী ১১/১২৬

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

أَلاَ كُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ،... وَالرّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ،... أَلاَ فَكُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ.

শুনে রাখো, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। নারী তার পরিবার, সন্তান-সন্ততির বিষয়ে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে

জিজ্ঞেস করা হবে। তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।... জেনে রাখো, প্রত্যেক ব্যক্তিই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৩৮; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৯২৮

আরেক হাদীসের ঘোষণা

ما مِن عبد اسْتَرْعاه اللهُ رعيّةً، فلم يَحُطْها بنصيحة، إلا لم يجدْ رائحة الجنة.
আল্লাহ তাআলা যদি বান্দাকে কারো দায়িত্বশীল বানান আর সে নিজ অধীনস্তদের কল্যাণের ব্যাপারে যত্নশীল না হয়, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৫০

সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার দায়িত্ব সম্পর্কে ইবনুল কাইয়্যুম রাহিমাহুল্লাহু বলেন-একজন আলেম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম পিতা-মাতাকে তার সন্তানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন। তারপর সন্তানকে জিজ্ঞাসা করবেন তার পিতা-মাতার ব্যাপারে। কেননা সন্তানের উপর পিতা-মাতার যেমন হক রয়েছে ঠিক তেমনই পিতা-মাতার উপরও সন্তানের হক রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছি।
সূরা আনকাবুত:০৮

অনুরূপ আরেক আয়াতে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ এবং পাথর।
সূরা আত তাহরীম:৬

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- 'সন্তানদেরকে ইলম শিক্ষার সাথে সাথে আদব-আখলাকও শিক্ষা দাও।'

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

'তোমরা আল্লাহ তাআলার ইবাদত কর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। আর পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করো।'
সুরা নিসা:৩৬

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

تَنَاوَلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ

'তোমরা সন্তানদের সাথে ইনসাফ করো।'
সুনানু আবি দাউদ:: ৩৫৪৪

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহ তাআলা সন্তানের ব্যাপারে পিতাকে আগে উপদেশ দিয়েছেন। পরে পিতার ব্যাপারে সন্তানকে উপদেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ

'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্রতার ভয়ে হত্যা করো না।
'সূরা ইসরা:৩১
অতএব, যে ব্যক্তি সন্তানকে উপকারী জিনিস শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে অবহেলা করলো এবং তাকে তার উপর ছেড়ে দিলো-সে তার প্রতি চরম পর্যায়ের দুর্ব্যবহার করলো। অধিকাংশ সন্তান তার পিতা-মাতার কারণে নষ্ট হয়। তাদেরকে অবহেলা করা এবং দ্বীনের ফরয ও সুন্নত বিধান না শিখানোর কারণেই তারা গোড়া থেকেই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তারা নিজেরাও উপকৃত হতে পারে না এবং পিতা-মাতাও বার্ধক্যে উপনীত হয়ে তাদের থেকে কোন উপকার লাভ করতে পারে না। কথিত আছে, কিছু লোক এক ছেলেকে তার পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার কারণে তিরষ্কার করছিলো। তখন সে বললো, আব্বাজান! আমি ছোট থাকা অবস্থায় আপনি আমার প্রতি মন্দ আচরণ করেছিলেন, তাই বড় হয়ে আমি আপনার অবাধ্যতা করছি। আপনি আমাকে শৈশবকালে নষ্ট করেছেন বিধায় আমি আপনাকে বৃদ্ধ কালে নষ্ট করছি। আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি কণা আল্লাহর দান। জীবনের প্রতিটি বিন্দু আল্লাহর দয়া।তাই

আমাদের অস্তিত্ব ও জীবন আল্লাহর কাছে ঋণী। আমাদের উপর আল্লাহর অফুরন্ত নিআমত রাজির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি নিআমত হল আমাদের সন্তানেরা। নিঃসন্তান দম্পতি কিংবা সন্তানহারা মাকে জিজ্ঞেস করুন, বুঝতে পারবেন, সন্তান কত বড় নিআমত! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَ اللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَ حَفَدَةً وَّ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَ بِنِعْمَتِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُوْن.َ

আল্লাহ তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন। আর ভালো-ভালো জিনিসের থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। তবুও কি তারা ভিত্তিহীন জিনিসের প্রতি ঈমান রাখবে আর আল্লাহর নিআমতসমূহের অকৃতজ্ঞতা করবে? সূরা নাহল : ৭২

সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। তাদের ঈমান-আকীদা, বোধ-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, আমল-আখলাক, জীবন যাপন প্রভৃতির ব্যাপারে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়া মাতা-পিতার কর্তব্য। আপনার সন্তান ছোট থাকা অবস্থায় ঈমানের উপর পরিচর্যা করার ব্যাপারে গুরুত্ব দিন। অপেক্ষা ত্যাগ করুন। কেননা শিশু মনে ঈমানের চারা রোপন করা বড় হয়ে আকীদা পরিবর্তন হওয়ার তুলনায় অধিক সহজ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তান-প্রীতি:

ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানব জাতির জন্য ছিলেন পরম দয়ার প্রতীক । তাঁর সন্তান ও পরিবারবর্গের প্রতি ভালোবাসা, যত্ন ও দয়া ছিল অসাধারণ। তিনি কেবল নিজের সন্তানদের প্রতিই স্নেহপ্রবণ ছিলেন না, বরং তিনি উম্মতের সন্তানদের প্রতিও ছিলেন অত্যন্ত সদয় ও দয়ার্দ্র।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর স্ত্রী খাদিজা (রা.)-এর গর্ভ থেকে ছয় সন্তান জন্মগ্রহণ করেন: কাসিম, জয়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম, ফাতিমা ও আব্দুল্লাহ। পরবর্তীতে মারিয়া কিবতিয়া (রা.)-এর গর্ভ থেকে ইব্রাহিম নামক এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। অধিকাংশ সন্তান তাঁর জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন, শুধু হযরত ফাতিমা (রা.) রাসূল (সা.)-এর পর কিছু দিন বেঁচে ছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তানের প্রতি অপার ভালোবাসা ও মমতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা মানবজাতির জন্য অনুকরণীয়। তিনি সন্তানদের সাথে কোমলভাবে কথা বলতেন, তাদের আদর করতেন, কাঁধে উঠিয়ে দিতেন এবং ভালোবাসার চুম্বনে সিক্ত করতেন।হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ، مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: "مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَم."ْ

একবার একজন বেদুঈন এসে রাসূল (সা.)-কে বলতে লাগলো, “আপনারা তো সন্তানদের চুম্বন করেন! অথচ আমি তো কখনো চুম্বন করিনি।” রাসূল (সা.) বললেন, “যদি আল্লাহ তোমার অন্তর থেকে দয়া উঠিয়ে নেন, তবে আমি কী করতে পারি?” (বুখারী:৫৯৯৭)

রাসূল (সা.)-এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) ছিলেন তাঁর হৃদয়ের টুকরো। তিনি যখন রাসূল (সা.)-এর কাছে আসতেন, তখন রাসূল (সা.) দাঁড়িয়ে যেতেন, তাঁকে চুম্বন করতেন এবং নিজের আসনে বসাতেন। একবার বলেন:

فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي

“ফাতিমা আমার অঙ্গের অংশ। যে তাকে কষ্ট দেয়, সে আমাকেও কষ্ট দেয়।” (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর প্রিয় পুত্র ইব্রাহিমের মৃত্যু সংবাদ পেলেন, তখন তিনি অত্যন্ত শোকাহত হয়েছিলেন। ইব্রাহিম ছিলেন মারিয়া কিবতিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে জন্মগ্রহণকারী পুত্র, যিনি ছোটবেলায়ই ইন্তেকাল করেন। হাদিসে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ، وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «يَا ابْنَ عَوْفٍ، إِنَّهَا رَحْمَةٌ»، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ»

ইব্রাহিমের মৃত্যুর সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কোলে তাঁকে নিয়ে ছিলেন। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। সাহাবীরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন:'আপনিও কি কাঁদছেন, হে আল্লাহর রাসূল?"তিনি উত্তরে বলেছিলেন:"এটা তো মমতার ফল। চোখ অশ্রুসিক্ত হয়, হৃদয় ব্যথিত হয়। তবে আমরা মুখ দিয়ে এমন কিছু বলি না যা আল্লাহ অপছন্দ করেন। আমরা শুধু এটুকুই বলি— ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হে ইব্রাহিম! আমরা তোমার কারণে অত্যন্ত শোকাহত।"

(সহীহ বুখারী :১৩০৩)

এই ঘটনাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মানবিক দিক ও সহানুভূতির এক গভীর উদাহরণ। তিনি তাঁর উম্মতকে শোক প্রকাশে ধৈর্য্য ও আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকার শিক্ষা দিয়েছেন।

রাসূল (সা.) হাসান ও হুসাইন (রা.)-কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি তাঁদের পিঠে উঠিয়ে নামাজ পড়তেন, কখনো কখনো দীর্ঘ সিজদা করতেন যাতে তারা না পড়ে যায়। তিনি বলতেন,

الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة

“হাসান ও হুসাইন জান্নাতী যুবকদের নেতা।” তিরমিজি:৩৭৬৮

শুধু নিজের সন্তান নয়, রাসূল (সা.) উম্মতের সকল শিশুদের প্রতিও দয়ার্দ্র ছিলেন। কোনো শিশু কান্না করলে তিনি নামাজ সংক্ষিপ্ত করতেন, যাতে মায়ের কষ্ট না হয়। বাচ্চাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করতেন এবং তাদেরকে আনন্দ দিতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন আদর্শ পিতা ও পিতামহ। তাঁর সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা, যত্ন ও আচরণ আমাদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ। আজকের দিনে পারিবারিক বন্ধন ও সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে তাঁর জীবনের আদর্শ অনুসরণ করলে সমাজে মমতা, দয়া ও শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। আমাদের উচিত, তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে সন্তানদের যথাযথ মর্যাদা ও ভালোবাসা প্রদান করা।

পিতামাতা সৎ হলে সন্তানও সৎ হয়:

পিতা-মাতা সৎ না হলে সন্তান কখনো সৎ হবে না। অবাধ্য সন্তান পিতা-মাতার নিজ হাতের কামাই। যেমনটি পূর্বসূরীরা বলেছেন। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য হলো একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও আনুগত্যে বড় করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালানো। হালাল সম্পদ উপার্জন ও আমলের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া। যেন সন্তান সৎ হলে এর ফল তারা ভোগ করতে পারে এবং তারাই যেন একমাত্র হতে পারে সন্তানের জন্য উত্তম আদর্শ।

পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

আর তাদের ভয় করা উচিত, যদি তাদের পশ্চাতে অসহায় সন্তান রেখে যেত, তাহলে তারা তাদের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হত। সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সঠিক কথা বলে।'সূরা নিসা:৯

এছাড়াও পবিত্র কুরআনে আরেক জায়গায় এসেছে,

كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

'তাদের পিতা ছিল সৎ।'সূরা কাহাফ:৮২

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-তাদের পিতা-মাতা সৎ হওয়ার কারণে তাদের দু'জনকে আল্লাহ তাআলার রহমতের চাদরে আবৃত করে রাখা হয়েছিল।

সাইদ ইবনু জুবাইর বলেছেন, 'আমি আমার সন্তানের জন্য বেশি বেশি নামায পড়তাম।' মাখলাদ রাহিমাহুল্লাহু বলেন, হিশাম রাহিমাহুল্লাহু বলেছেন, তার হেফাযতের আশায় (আমি এটা করতাম)।

এতদাসত্ত্বেও আপনি দেখতে পাবেন কিছু সন্তান পিতা-মাতার অবাধ্য হয়, তবে এর সংখ্যা খুব বেশি না। এর পিছনে এমন কোন হেকমত আছে যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না। যেমন, নূহ আলাইহিস সালাম ও তাঁর সন্তানের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা। এটা মূলত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আগত একটি পরীক্ষা। এজন্য পিতা-মাতার উপর কর্তব্য হলো, সর্বদা আল্লাহ তাআলার দিকে মনোনিবেশ করা। তাঁর সামনে নতশির হয়ে থাকা। বেশি বেশি দু'আর গুরুত্ব দেয়া। মানুষের হেদায়েত আল্লাহ ছাড়া আর কারো হাতে নেই। অবশ্য পিতা-মাতার জন্য এতটুকুর অবকাশ রয়েছে যে, তারা আবশ্যকীয় কিছু মাধ্যম গ্রহণ করবে। সন্তানকে শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে বন্ধুসুলভ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ আচারণ করবে। প্রতিটা জিনিস হাতে-কলমে বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে। কারণ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

'আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত দিতে পারেন না বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন। আর হেদায়েতপ্রাপ্তদের ব্যাপারে তিনিই ভালো জানেন।'সূরা কাসাস:৫৬

এমনিভাবে আমরা আরো দেখতে পাই যে, কাফের পিতা-মাতার ঘরে নেককার সন্তান। যেমন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার কাফের পিতা আযরের কোলে বড় হয়েছেন। যিনি কুফুরিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন।

নেককার জীবনসঙ্গী নির্বাচন করা:

সন্তানদের আকীদা পরিশুদ্ধ করার ক্ষেত্রে নেককার জীবনসঙ্গী গ্রহণের অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। এটা দু'জনের মধ্য থেকে একজনের দ্বারা পূর্ণতা পাবে না। বরং উভয়েরই নেককার হতে হবে। জনৈক দার্শনিক বলেছেন, নারী-পুরুষ হলো একটি কবিতার দু'টি চরণের মতো। সুতরাং ঐ কবিতার চরণ অসুন্দর, যার এক অংশ মজবুত আরেকাংশ দুর্বল।তাইতো শরিয়ত দ্বীনদারির ভিত্তিতে জীবনসঙ্গী নির্বাচনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্বাচনের ব্যাপারে বলেছেন-

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

'তোমরা যার দ্বীনদারি ও নৈতিক চরিত্রে সন্তুষ্ট আছো, তোমাদের নিকট সেই ব্যক্তি প্রস্তাব দিলে, তার সোথে (তোমাদের পাত্রীদের) বিবাহ দিয়ে দাও। তা যদি না করো পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ ও চরম বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে।'
আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ১০৮৫।

আর স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

'চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে মেয়েদের বিয়ে করা হবে, তার সম্পদ। তার বংশ মর্যাদা। তার সৌন্দর্য ও তার দ্বীনদারী। সুতরাং তুমি দ্বীনদারীকেই অধিক প্রাধান্য দাও নতুবা তুমি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।'
আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৪৮০২

সালাফগণ সুসন্তান গড়নের ব্যাপারে উত্তম স্ত্রী গ্রহণ করার বেশ গুরুত্ব দিতেন। তাই আবুল আসওয়াদ স্বীয় ছেলেদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন-'আমি তোমাদের সাথে সর্বদা উত্তম আচরণ করেছি। তোমাদের শিশুকাল থেকে শুরু করে বড় হওয়ার পরেও উত্তম আচারণ করেছি। এমনকি তোমাদের জন্মের পূর্বেও।'
তার ছেলেরা বলল-'আমাদের জন্মের পূর্বে কিভাবে আপনি আমাদের সাথে উত্তম আচারণ করেছেন?'তিনি বললেন-'যেসব স্থান তোমাদের কাছে লজ্জাজনক সেখানে আমি তোমাদেরকে রাখিনি। আর আমি তোমাদের জন্য এমন 'মা' নির্বাচন করেছি; যার কারণে তোমরা

নিন্দাযোগ্য কখনো হবে না। অর্থাৎ তোমরা যেন কোন মানুষের নিকট লজ্জার কারণ না হও এবং তোমাদের মাও যেন তোমাদের নিকট লজ্জার কারণ না হয়।'

স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সৎ ও নেককার হওয়ার এতো গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও এ অঙ্গনে এমন কিছু উজ্জল দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, দুজনের একজন নেককার হলেই সন্তান নেককার হতে পারে। সন্তান সৎ হওয়ার কারণ কখনো স্ত্রী একাই হয় কখনো স্বামীও একা হতে পারে। আর হ্যাঁ, এর জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে অকৃত্রিম সাহায্য প্রার্থনা ও দীর্ঘ চেষ্টা-মেহনত করতে হবে।

সহবাসের পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ করা:

সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার যিকির করা মুস্তাহাব। বিশেষকরে চাহিদা পূরণ করার সময়। বরকত লাভের জন্য এবং শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

'তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে মিলনের পূর্বে যদি বলে

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

"উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশাইতনা ওয়া জান্নিবনাশাইতনা মা রাযাকতানা'।

'অর্থ: আল্লাহ তাআলার নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শাইতান থেকে দূরে রাখ এবং আমাদেরকে যা দান করবে তাও শাইতান থেকে দূরে রাখ।' আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৩০৯৮

তাদেরকে এমন সন্তান দান করা হবে, শাইতান যাকে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।"

হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহু বলেন, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে মিলনে যায় তাহলে সে যেন বলে-

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا، وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ نَصِيبًا

فِيمَا رَزَقْتَنَا

“উচ্চারণ: বিসমিল্লহি আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীমা রাযাক্বতানা, ওয়ালা তাজআল লিশাইতানি নাসিবান্ ফীমা রাযাক্তানা।"

'অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে যা দান করবেন তাতে বরকত দান করুন এবং শয়তানের জন্য কোন অংশ রাখবেন না।'

এ পদ্ধতিতে যদি সে গর্ভবতী হয়, তাহলে সে একজন নেককার সন্তান লাভ করবে। অনুরূপভাবে সহবাসের সময় সওয়াব লাভের প্রতি গুরুত্ব দেয়া। সুতরাং তারা যদি নেককার সন্তান লাভ করে তাহলে তা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় এবং সওয়াব লাভের প্রত্যাশাই হবে। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"وفي بضع أحدكم صدقة". قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر."

"তোমাদের শরীরের সদকা রয়েছে।" অর্থাৎ আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি সদকা। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের কেউ তার কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য বৈধ পন্থা অবলম্বন করে এতেও কি তার সওয়াব হবে? তিনি বললেন, তোমরা বলো দেখি, যদি
তোমাদের কেউ হারাম পথে নিজের চাহিদা মিটাত বা যেনা করত তাহলে কি তার গুনাহ হতো না? অনুরূপভাবে যখন সে হালাল বা বৈধ পন্থায় চাহিদা মিটাবে তাতে তার সওয়াব হবে।'
(সহিহ মুসলিম:১০০৬)

নেককার সন্তান লাভের জন্য দোয়া করা:

যে কোনো বিষয়ে মানুষের সফলকাম হওয়ার তাওফিক লাভ করতে হলে দু'আর ভূমিকা সর্বাধিক। এটা সন্তান নেক ও সৎ হওয়ার বড় মাধ্যমও বটে। এর পরিণামে আপনি তাকে খুব বেশি কুরআনের মজলিসে উপস্থিত হতে দেখতে পারবেন। তাছাড়া নবিদের আদর্শও ছিল নিজ সন্তানাদির জন্য দু'আ করা।

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার রবের নিকট এই বলে দু'আ করছিলেন- رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

অর্থ:হে আমার রব! আমাকে নেককার সন্তান দান করুন!সূরা সফফাত: ১০০

তিনি আরো বলতেন-

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

'হে আমাদের রব! আমাদেরকে আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধরের মধ্য থেকে আপনার অনুগত জাতি বানান। আর আমাদেরকে আপনার ইবাদতের বিধি-বিধান দেখিয়ে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

সূরা বাকারাহ:১২৮

যাকারিয়া আলাইহিস সালাম দু'আ করতেন-

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

অর্থ: হে আমার রব! আপনি আমাকে আপনার পক্ষ থেকে আমাকে উত্তম সন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।

সূরা আলে ইমরান:৩৮

অনুরূপ তিনি আরো দু'আ করতেন-

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

إِمَامًا

'হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তান দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন।' সূরা আল ফুরকান: ৭৪।

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যদিও চক্ষু শীতল হওয়াটা সঠিকভাবে বর্ণিত হয়নি তবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যশীল হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। এ ধরনের আরো কিছু আয়াত রয়েছে। যেমন:
আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي

'আপনি আমার বংশধরদের মধ্যে সংশোধন করে দিন।'
সুরা আহকাফ: ১৫।

وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

'আর আমি নিশ্চয় তাকে ও তার সন্তানদেরকে বিতাড়িত শাইতান থেকে আপনার আশ্রয়ে অর্পণ করছি। 'সুরা আল ইমরান: ৩৬।

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

'আর আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন। সূরা ইবরাহিম: ৩৫।

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

'হে আমার রব! আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানান এবং আমার বংশদরদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের রব, আর আমাদের দু'আ কবুল করুন।'সূরা ইবরাহিম: ৪০।
সুতরাং নেক সন্তান প্রার্থনার জন্য বেশি বেশি দু'আ করা থেকে উদাসীনতার ব্যাপারে সতর্ক থাকা আমাদের জন্য অতি আবশ্যক।

গর্ভাবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি গুরুত্ব দান:

মানুষের জীবন যাত্রা ও চিন্তা-চেতনা সুগঠনের ক্ষেত্রে কুরআনের বড় একটি প্রভাব রয়েছে। নিঃসন্দেহে সন্তান ভ্রুণ থাকা অবস্থায়ই কুরআনের প্রতি তার একটা ভালোবাসা জন্মায়; যদি তার মা কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি যত্নবান থাকে।

এক শিশু ভ্রুণ থাকা অবস্থায় তার মায়ের আওয়াজ দ্বারা প্রভাবিত হয়। মায়ের কুরআন তিলাওয়াত শুনে শুনে শিশুটির মস্তিষ্ক চাঙ্গা হতে থাকে। রাত দিনের কিছু অংশে মায়ের কণ্ঠে কি এক মনকাড়া কুরআনের সুমধুর আওয়াজ! এমনকি সে তার মায়ের কাছ থেকেই শিখে নেয় বিশুদ্ধ আরবী ভাষা।

আমার এক বান্ধবী আমাকে বললো, সে একবার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তার এক পরিচিত বোনের বাসায় গিয়েছেন। তিনি ঐ বোনের মেয়েকে শিষ্টাচার ও চরিত্রের সুউচ্চ শিখরে দেখতে পেলেন। তাই আমার বান্ধবী আশ্চর্য হয়ে তার বান্ধবীকে জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটা এত ভদ্র হলো কীভাবে? সে বললো, মেয়ে পেটে থাকাবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি আমি খুব যত্নবান ছিলাম। এটাই তাদেরকে কুরআনের পাখি বানিয়েছে। করেছে উত্তম চরিত্রের অধিকারি।

মাসে কমপক্ষে একবার হলেও কুরআন খতম করা আপনার জন্য উত্তম। হাদিসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: "فِي شَهْرٍ."

আবদুল্লাহ ইবনু আমর রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি কুরআন কতটুকু পড়বো? তিনি বললেন, এক মাসে খতম করো। আস সুনান, ইমাম তিরমিযি:২৯৪৬

এখানে আরেকটি স্তরের কথা উল্লেখ করব। আর তা হলো, কুরআনের প্রতি শিশুর ভালোবাসা তৈরী করা। এর মোক্ষম সময় হলো সে যখন ভ্রূণ অবস্থায় থাকে, তখন কুরআন মাজীদ বেশি বেশি তিলাওয়াত করা। তাহলে সে শুরু থেকেই কুরআন শ্রবণের প্রতি অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। এতে করে আল্লাহ তাআলার কালামের সাথে তার অন্তরঙ্গতা তৈরী হবে এবং আপন রবের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে। পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় কুরআন মুখস্থ করা তার জন্য সহজ থেকে সহজতর হয়ে যাবে।

ভূমিষ্ট সন্তানের জন্য শাইতান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা:

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَان ُ
حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ، غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا

'এমন কোন আদম সন্তান নেই যাকে জন্মের সময় শাইতান স্পর্শ করে না। জন্মের সময় শাইতান স্পর্শের কারণেই সে চিৎকার করে কাঁদে। তবে মারয়াম এবং তাঁর ছেলে (ঈসা আ.) এর ব্যতিক্রম।'সহিহ বুখারী:৩৪৩১
এ জন্য সন্তান জন্ম গ্রহণের সময় বিতারিত শাইতান থেকে প্রার্থনা করা আবশ্যক। যেমনটি ইমরানের স্ত্রী করেছেন যখন তাকে মারইয়ামের মতো একজন সতী নারী দান করা হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

'আর আমি তার নাম রেখেছি মারইয়াম এবং আমি নিশ্চয় তাকে ও তার সন্তানদেরকে বিতারিত শাইতান থেকে আপনার আশ্রয় দিচ্ছি।' সূরা আলে ইমরান:৩৬

এ দু'আ পাঠ করার বিনিময়ে মারয়াম ও তাঁর সন্তানাদি নেককার হওয়ার বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। আল্লাহ তাকে সুন্দরতম পদ্ধতিতে কবুল করেছেন এবং তাকে উত্তমরূপে প্রবৃদ্ধি দান করেছেন।

শিশুর জন্মলগ্নে ইসলামি রীতিনীতি:

শিশুর আগমনের সুসংবাদ অন্যান্য মানুষের নিকট পৌঁছাতে হয়।এটি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। কুরআনে এই রীতির প্রতিফলন দেখা যায়। ফেরেশতারা আল্লাহর পক্ষ থেকে জাকারিয়া-কে তাঁর অনাগত পুত্র সন্তান ইয়াহইয়া-এর সুসংবাদ দিয়েছিলেন-

اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰي مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন, যে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণীর সত্যায়নকারী, নেতা ও নারী সম্ভোগমুক্ত এবং নেককারদের মধ্য থেকে একজন নবী।সূরা আলে ইমরান: ৩৯
একইভাবে আল্লাহ ইবরাহিম-কেও তাঁর আগত সন্তানের সুসংবাদ দিয়েছিলেন-

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ

'আমি তাঁকে একটি ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।' সূরা সফফাত: ১০১
সন্তান আগমনের আনন্দ শুধু পিতা-মাতাকেই উদ্বেলিত করে না; বরং সমাজের অন্যান্য মানুষদেরও আনন্দিত করে। ফলে তারা নতুন সন্তানকে সাদরে বরণ করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে।
এই ক্ষেত্রে অনেক সাংস্কৃতিক প্রচলনও রয়েছে। যেমন-মিষ্টি বিতরণ, দরিদ্রদের খাওয়ানো ইত্যাদি। এগুলো করতে কোনো বিধিনিষেধ নেই, কিন্তু পরিবারে নতুন সদস্য আগমনের পর নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অবশ্যই পালন করতে হবে।

সন্তান ভূমিষ্ঠের পর হাদিসে বর্ণিত নির্দিষ্ট সুন্নত ও আদবগুলো তুলে ধরা হলো—
১) সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া মাত্রই প্রথমে নবজাতককে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ডান কানে আজান ও বাম কানে ইকামত দেয়া।আজান দেয়ার মাধ্যমে শয়তান দূরে সরে যায়।
عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ.

অনুবাদ:
আবু রাফে বলেন

"আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যখন ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে জন্ম দেন, তখন তিনি তার ডান কানে আজান দিয়েছিলেন।"
— (সুনান আত-তিরমিজি, হাদীস: ১৫১৪)

২)তাহনীক করানো।হাদিসে এসেছে,

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ.

— সহীহ বুখারি: ৫৪৬৭; সহীহ মুসলিম: ২১৪৫

অর্থ:

আবু মূসা (রাঃ) বলেন:
আমার একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিলে আমি তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে যাই। তিনি তার নাম রাখেন ইব্রাহিম, তাকে খেজুর চিবিয়ে তাহনীক করেন, তার জন্য বরকতের দোয়া করেন এবং তাকে আমাকে ফিরিয়ে দেন।

৩)সুন্দর নাম একটি শিশুর অধিকার। কারণ, এই নামেই তাকে পুরো জীবনব্যাপী ডাকা হবে। মুসলিম পিতা-মাতার কর্তব্য হলো-সন্তানদের ভালো ও অর্থবহ নাম রাখার চেষ্টা করা। আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলির সাথে সম্পর্কিত করে যেসব নাম রাখা হয়, সেগুলো উত্তম নাম। যেমন: আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান ইত্যাদি। এছাড়াও নবিগণ ও পূর্ববর্তী মুসলিম মনীষীগণের নামের সাথে মিলিয়ে সন্তানের নাম রাখা উত্তম। তবে অবশ্যই নেতিবাচক ও অর্থহীন নাম পরিহার করতে হবে। কারণ, রাসূল কুরুচিপূর্ণ ও খারাপ অর্থবোধক নামগুলোকে পরিবর্তন করে দিতেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ

'তাদেরকে তাদের পিতার নাম অনুযায়ী ডাকো, যা আল্লাহর মতে ন্যায়ের কাছাকাছি। তোমরা যদি তাদের পিতাকে না চেনো, তাহলে তারা দ্বীনের দিক দিয়ে তোমাদের ভাই এবং এমন মানুষ, যারা তোমাদের আশ্রয়ে রয়েছে।' সূরা আহযাব: ৫

تسمية المولود باسم حسن ذي معنى في اليوم السابع من ولادته.হাদিসে এসেছে,
)الترمذي

জন্মের সপ্তম দিন নবজাতকের উত্তম ও সুন্দর অর্থবোধক নাম রাখা।
(তিরমিজি ২/১১০)

جَسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِহজরত জাসামী রা. থেকে বর্ণিত,
وَسَلَّم:َ
"سَمُّوا بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاء".ِ
-مسند الإمام أحمد533 :

তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা শিশুদের নাম নবী রাসূলদের নামে রাখো। সুতরাং এমন নাম নির্বাচন করা উচিত যা অর্থবহ এবং সত্যতার ওপর যার ভিত্তি রয়েছে। - (মুসনাদে ইমাম আহমাদ, ৫৩৩)

৪) জন্মের সপ্তম দিনে মাথার চুল, হাত-পায়ের নখ ইত্যাদি পরিষ্কার করা।
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:
«كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه، ويسمى»
প্রত্যেক শিশু তার আকীকার কারণে বাঁধা থাকে। তার পক্ষ থেকে সপ্তম দিনে পশু জবাই করা হবে, সে দিনই তার নাম রাখা হবে এবং মাথা মুণ্ডানো হবে।"
— (তিরমিজি: হাদীস ১৫২২)

আরেক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,
أن النبي صلى الله عليه وسلم "عق عن الحسن، وقال: يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة"
—جامع الترمذي، حديث رقم1519 :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান রা.-এর আকীকা দিয়ে ফাতেমা রা.-কে বললেন, তার মাথা মুণ্ডন করে দাও এবং চুলের ওজন পরিমাণ রূপা সদকা করে দাও। - (জামে তিরমিজি, হাদীস ১৫১৯)

৫) মাথা মুন্ডনের পর জাফরান দিয়ে মাথা ধৌত করা।

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:َ
أَنَّهَا حَلَقَتْ رَأْسَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَتَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا فِضَّةً، وَغَسَلَتْ رُؤُوسَهُمَا بِالْخَلِّ وَالزَّعْفَرَانِ.ِ

বাংলা অনুবাদ:

ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কন্যা বলেন: "তিনি হাসান ও হুসাইনের সপ্তম দিনে মাথা মুন্ডন করেন, তাদের চুলের ওজন অনুযায়ী রূপা সদকা করেন এবং তাদের মাথা ভিনেগার ও জাফরান দিয়ে ধৌত করেন।"(আবু দাউদ:عَنْ৩৯৩)

৬) সন্তানের পুরো মাথার চুলের সমপরিমাণ ওজনের রৌপ্য সদকা করা। (জাদুল মাআদ, ২/৪)

হজরত জাফর বিন মুহাম্মদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত হাসান, হুসাইন, জয়নব ও উম্মে কুলসুমের চুল ওজন করে সে পরিমাণ রোপা সদকা করে দিয়েছেন। (মুয়াত্তা মালিক, ১৮৩৯, শুয়াবুল ঈমান, হাদীস,৮২৬২)

৭) জন্মের সপ্তম দিন আকিকা করা। সপ্তম দিনে সম্ভব না হলে চৌদ্দতম দিনে অথবা একুশতম দিনে আকিকা করা। (বাজলুল মাজহুদ, ৪/৮৬)

হজরত সামুরা বিন জুন্দুর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত,

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:َ
»كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى فِيهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ«ُ
(—سنن أبي داود، ٣٩٢/٢، حديث(٢٨٣٨ :

রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘প্রত্যেক সন্তান রাহানস্বরূপ (বন্ধক) ওই আকিকার পরিবর্তে, যে আকিকা ওই ছেলের পক্ষ থেকে সপ্তম দিনে জবাই করা হয় এবং তার নাম রাখা হয়, তার মাথা মুণ্ডন করা হয়।’ (আবু দাউদ : ২/৩৯২)
এছাড়াও আরো বর্নিত আছে,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَت:ْ
»أُمِرْنَا أَنْ نُعِقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاة«ٌ
) —سنن أبي داود، ٢/٣٩٢، حديث(٢٨٣٤ :

ছেলের পক্ষ থেকে দুটি ছাগল এবং মেয়ের পক্ষ থেকে একটি ছাগল আকিকা করা উত্তম। (আবু দাউদ, ২/৩৯২)
আরো বর্নিত আছে:

عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُول:ُ
»عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاة«ٌ

উম্মে কুরযিল কাবিয়্যাহ রা. বলেন, আমি রাসূল সা.- কে বলতে শুনেছি যে, ছেলের জন্য দু’টি একইমানের বকরী ও মেয়ের পক্ষ থেকে একটি বকরী (আকিকা দিবে)। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস, ২৮৩৬, সুনানে তিরমিজি, হাদীস, ১৫১৩)

কন্যা সন্তান আল্লাহর রহমত:

আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুই ভাগে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষ আর নারী। এভাবে সৃষ্টি করা আল্লাহ তাআলার হিকমত ও কল্যাণ-জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। তবে আল্লাহ তাআলা কাউকে শুধু কন্যা সন্তানই দান করেন। আবার কাউকে পুত্র সন্তান। কাউকে আবার পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন। কাউকে কাউকে আবার কোনো সন্তানই দান করেন না। এ বণ্টনও আল্লাহ তাআলার বিশেষ হিকমত ও কল্যাণ-জ্ঞানের ভিত্তিতেই হয়। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَأَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا. তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা করে দেন বন্ধ্যা। -সূরা শুরা (৪২) : ৪৯-৫০

কন্যা সন্তান মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মা-বাবার জন্য একটি বিশেষ নেয়ামত। কন্যা সন্তানকে অশুভ মনে করা কাফেরদের বদস্বভাব। আইয়্যামে জাহিলিয়াতের সেই সময়ে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত মাটি দেয়া হতো। সন্তানকে অপছন্দ করা খাঁটি মুমিনের পরিচয় নয়। কন্যাসন্তানকে অশুভ বা অকল্যাণকর মনে করা ইসলামে একটি গর্হিত কাজ। ইসলাম পূর্ব যুগে আরবে কন্যা জন্মলাভ হওয়াকে নিজের জন্য অপমানের বিষয় মনে করা হতো। ইসলাম এ কুপ্রথার অবসান ঘটিয়েছে।
আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلۡأُنثَىٰ ظَلَّ وَجۡهُهُۥ مُسۡوَدّٗا وَهُوَ كَظِيمٞ ٥٨ يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓۚ أَيُمۡسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمۡ يَدُسُّهُۥ فِي ٱلتُّرَابِۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ

‘যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ অন্ধকার হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে নাকি তাকে মাটির নিচে পুতে ফেলবে। শুনে রাখো, তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট।’ -(সুরা আন-নাহল, আয়াত : ৫৮-৫৯)

অন্যত্র তিনি বলেন,

٨وَإِذَا ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ سُئِلَتۡ ٨ بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ ٩

"আর যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে"? [সূরা আত-তাকওয়ীর, আয়াত: ৮-৯]

কন্যা সন্তানের মাধ্যমে আল্লাহ পরিবারে সুখ ও বরকত দান করেন। হাদিসে এমন কথা উল্লেখ হয়েছে।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَহজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে নবী (সা.) বলেন, رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:َ

"مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ، وَضَمَّ أَصَابِعَه".ُ

'যে ব্যক্তি দু'টি কন্যাকে তারা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, কেয়ামতের দিন আমি এবং সে এ দু'টি আঙ্গুলের মতো পাশাপাশি আসবো (অতঃপর তিনি তার আঙ্গুলগুলি মিলিত করে দেখালেন)'। (মুসলিম, হাদিস নং: ২৬৩১, তিরমিজি, হাদিস নং: ১৯১৪, মুসনাদ আহমদ, হাদিস নং: ১২০৮৯, ইবনু আবি শাইবা, হাদিস নং: ২৫৯৪৮)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:َ

"مَنْ وُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، فَلَمْ يُؤْذِهَا، وَلَمْ يُهِنْهَا، وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّة".َ

রাসুল (সা.) ইরশাদ করনে, 'যার ঘরে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলো, অতঃপর সে ওই কন্যাকে কষ্ট দেয়নি, মেয়ের ওপর অসন্তুষ্টও হয়নি এবং পুত্র সন্তানকে তার ওপর প্রধান্য দেয়নি, তাহলে ওই কন্যার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ' (মুসনাদ আহমদ, হাদিস নং: ১/২২৩)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار".
وفي رواية:

فقال رجل: يا رسول الله، واثنتان؟ قال: "واثنتان".
قال: يا رسول الله، وواحدة؟ قال: "وواحدة".

المرجع: البيهقي في شعب الإيمان(8311)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, 'যার তিনটি কন্যাসন্তান থাকবে এবং সে তাদের কষ্ট-যাতনায় ধৈর্য ধরবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুহাম্মদ ইবন ইউনূসের বর্ণনায় এ হাদীসে অতিরিক্ত অংশ হিসেবে এসেছে) একব্যক্তি প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রাসুল, যদি দু'জন হয়? উত্তরে তিনি বললেন, দু'জন হলেও। লোকটি আবার প্রশ্ন করলো, যদি একজন হয় হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন, একজন হলেও। ' (বাইহাকি, শুয়াবুল ঈমান : ৮৩১১)

আউফ বিন মালেক আশজায়ি (রা.) থেকে বর্ণিত,
عن عَوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له ثلاث بنات، فأنفق عليهن حتى يزوجهن أو يمتن، كن له حجاباً من النار".
فقالت امرأة: يا رسول الله، وإن كانت له اثنتان؟ قال: "واثنتان".

তিনি বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন,'যে ব্যক্তির তিনটি মেয়ে রয়েছে, যাদের ওপর সে অর্থ খরচ করে বিয়ে দেওয়া অথবা মৃত্যু পর্যন্ত, তবে তারা তার জন্য আগুন থেকে মুক্তির কারণ হবে। তখন এক নারী বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আর দুই মেয়ে হলে? তিনি বললেন, দুই মেয়ে হলেও। ' -(বাইহাকি, শুয়াবুল ঈমান, হাদিস নং : ৮৩১৩)

হযরত আবদুল্লাহ উমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'ওই নারী বরকতময়ী ও সৌভাগ্যবান, যার প্রথম সন্তান মেয়ে হয়। কেননা, (সন্তানদানের নেয়ামত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে) আল্লাহ তায়ালা মেয়েকে আগে উল্লেখ করে বলেন, তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। ' -(কানযুল উম্মাল ১৬:৬১১)
আয়েশা (রা.) বলেন, عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتاها، تسألني، فلم تجد عندي شيئاً إلا تمرة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها، ولم تأخذ منها شيئاً، ثم قامت وخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثته حديثها، فقال: "من ابتلي بالبنات فصبر عليهن، كن له ستراً من النار".

'আমার কাছে এক নারী এলো। তার সঙ্গে তার দুই মেয়ে। আমার কাছে সে কিছু প্রার্থনা করলো। সে আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া কিছুই দেখতে পেলো না। আমি তাকে সেটি দিয়ে দিলাম। সে তা গ্রহণ করলো এবং তা দুই টুকরো করে তার দুই মেয়ের মাঝে ভাগ করে দিলো। তা থেকে সে নিজে কিছুই খেলো না। তারপর নারীটি ও তার মেয়ে দু'টি উঠে পড়লো এবং চলে গেলো।

ইত্যবসরে আমার কাছে নবী (সা.) এলেন। আমি তার কাছে ওই নারীর কথা বললাম। নবী (সা.) বললেন, 'যাকে কন্যা দিয়ে কোনো কিছুর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয় আর সে তাদের প্রতি যথাযথ আচরণ করে, তবে তা তার জন্য আগুন থেকে রক্ষাকারী হবে। ' -(মুসলিম, হাদিস নং : ৬৮৬২; মুসনাদ আহমদ, হাদিস নং : ২৪৬১৬)

শিশুমনে আকীদা বদ্ধমূল করার গুরুত্ব:

শিশুমনে আকীদা (বিশ্বাসমূলক বিষয়াবলি) বদ্ধমূল করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি একটি শিশুর ব্যক্তিত্ব, নৈতিকতা এবং ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি গঠনে মূল ভূমিকা। নিচে এর গুরুত্বগুলো তুলে ধরা হলো:

১.আত্মপরিচয় গঠনে সহায়ক: শিশুরা যখন তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে ছোটবেলা থেকেই জানতে শেখে, তখন তাদের মাঝে একটি ইসলামী আত্মপরিচয় গড়ে ওঠে।

২.নৈতিকতা ও চরিত্র উন্নয়ন: সঠিক আকীদা একটি শিশুকে ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে শেখায়, ফলে তারা ন্যায়ের পথে চলতে উৎসাহ পায়।

৩. আত্মবিশ্বাস ও মানসিক স্থিতিশীলতা: আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস একটি শিশুকে ভয়মুক্ত ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। তারা জানে, আল্লাহ সবকিছু দেখছেন এবং তাদের সাহায্য করবেন।

৪.শক্তিশালী জীবনদৃষ্টি: আকীদা একজন শিশুকে শুধু ইহজাগতিক নয়, পরকালকেও গুরুত্ব দিতে শেখায়, ফলে তারা দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য নিয়ে জীবন পরিচালনা করতে পারে।

৫. ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে রক্ষা: যখন শিশুদের মনে সঠিক আকীদা গেঁথে দেওয়া হয়, তারা বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা, কুসংস্কার ও ভুল পথে চালিত হওয়া থেকে নিরাপদ থাকে।

শিশুকে আকীদা শেখানোর কার্যকর উপায়সমূহ:

১. আল্লাহর অস্তিত্ব ও গুণাবলি সহজ ভাষায় শেখানো।
শিশুকে বোঝাতে হবে: "আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি সব কিছু দেখতে পান, শুনতে পান এবং জানেন।"
গল্প ও উদাহরণের মাধ্যমে আল্লাহর দয়া, ক্ষমাশীলতা ও শক্তি বোঝানো যেতে পারে।

২. তাওহীদের শিক্ষা প্রদান:

একমাত্র আল্লাহকেই উপাসনা করা উচিত—এই বিশ্বাস শিশুদের মনে গেঁথে দিতে হবে।

শিরক (অন্য কিছুকে আল্লাহর সাথে শরিক করা) কী এবং কেন তা ভুল—তা ছোট ছোট উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যায়।

৩. রাসূল (সা.) এর প্রতি ভালোবাসা তৈরি করা:
নবীজীর জীবনের ছোট ছোট ঘটনা ও গল্প (যেমন: সততা, দয়া, করুণা) শিশুদের মনে সহজে আকৃষ্ট হয়।
তাঁর প্রতি সালাম ও দরূদ পাঠের গুরুত্ব শেখানো।

৪. আখিরাতের ধারণা সহজভাবে দেওয়া:
ভালো কাজ করলে জান্নাত, খারাপ কাজ করলে জাহান্নাম—এই ধারণা শিশুদের নৈতিকতা গঠনে সাহায্য করে।

ভয় নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালো কাজ করতে উৎসাহ দেওয়া উচিত।

৫. প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া:
শিশুদের প্রশ্ন করতে দিন এবং সহজ ও সহানুভূতিশীলভাবে উত্তর দিন।

“আল্লাহ কোথায়?”, “তিনি কেমন করে সব কিছু জানেন?”—এমন প্রশ্নে বিরক্ত না হয়ে ধৈর্য ধরে বোঝান।

৬. প্রতিদিনের জীবনে আকীদার চর্চা:

খাবার খাওয়ার আগে-পরে, ঘুমানোর আগে, ঘর থেকে বের হওয়ার আগে দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর উপর নির্ভরতা গড়ে তোলা।
ঘটনা বা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আল্লাহর কুদরত বোঝানো।

৭. বাস্তব জীবনচর্চায় অভ্যস্ত করা:
নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, ইসলামী আদব-কায়দা শেখানোর মাধ্যমে শিশুর চিন্তা-চেতনায় ইসলামী মূল্যবোধ গড়ে তোলা।

শিশুবয়সে ঈমানি পরিচর্যা পেয়ে বড় হয়েছেন যারা:

"শিশু বয়সে ঈমানি পরিচর্যা পেয়ে বড় হয়েছেন যারা" — এ ধরনের মানুষদের উদাহরণ ইসলামের ইতিহাসে অসংখ্য রয়েছে। কয়েকজন বিখ্যাত সাহাবি ও ইসলামী ব্যক্তিত্বের কথা বলা হলো যারা ছোটবেলা থেকেই ঈমানি পরিবেশ ও শিক্ষায় বেড়ে উঠেছিলেন:

১. হযরত আলী (রাঃ) – ছোটবেলায়ই রাসূল (সা.) এর ঘরে বড় হন। ইসলামের প্রথম যুগে তিনি শিশু বয়সেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

২. হযরত উসমান (রাঃ) – ধনবান ও সম্মানিত পরিবারে জন্ম হলেও ছোটবেলা থেকেই তার চরিত্র ছিল পবিত্র ও সরল, এবং ইসলাম গ্রহণের পর তিনি বিশাল অবদান রাখেন।

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) – তিনি ছিলেন নবী করিম (সা.)-এর চাচাতো ভাই ও অল্প বয়সেই ইসলামের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তাকে "তাফসিরের ইমাম" বলা হয়।

৪. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) – ছোট বয়সে রাসূল (সা.)-এর খেদমতে নিযুক্ত হন এবং নবীজির কাছ থেকে সরাসরি তালীম ও আদব শিখে বেড়ে ওঠেন।

৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রাঃ)

পিতা: সাহাবি জুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ)
মাতা: আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ)
শিশুকাল থেকেই দ্বীনদার পরিবেশে মানুষ হন। পরিণত বয়সে মক্কার খিলাফতের দায়িত্ব নেন এবং শহীদ হন অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে।

৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)

পিতা: হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)
অল্প বয়সেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবীজি (সা.)-এর সঙ্গে সময় কাটান। তরুণ বয়সেই অনেক হাদীস বর্ণনা করেন এবং ইবাদতে অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন।

৭, হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ)

নবীজির দৌহিত্র, হযরত আলী (রাঃ) ও ফাতিমা (রাঃ)-এর সন্তান।

নবীজি (সা.)-এর আদরের নাতি হিসেবে ছোট থেকেই তাঁর সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠেন। ঈমান, ইখলাস ও সাহসিকতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।
৮. আতাঈ ইবনে আবি রাবাহ (রহ.)

তাবি'ঈদের একজন। অল্প বয়স থেকেই ইলম হাসিল শুরু করেন এবং মক্কা-মদিনার বড় মুফতিদের একজন হিসেবে পরিচিতি পান।

৯. ইমাম নববী (রহ.)

ছোটবেলা থেকেই নেককার, দুনিয়াবিমুখ ও ইলমপ্রেমী ছিলেন। মাত্র ৭ বছর বয়সেই কুরআন হিফজ সম্পন্ন করেন। পরে হয়ে ওঠেন বিখ্যাত মুজতাহিদ ও "রিয়াদুস সালিহিন" এর রচয়িতা।

১০. ইমাম শাফঈ (রহ.)
মাত্র ৭ বছর বয়সে কুরআন হিফজ করেন। ১০ বছর বয়সে 'মুয়াত্তা' ইমাম মালিকের মুখস্থ করেন। তাঁর ঈমানি পরিচর্যা এবং বিদ্যা তাঁকে ইসলামী ফিকাহর অন্যতম ইমাম বানায়।

শৈশবের দ্বীনি পরিচর্যা একজন মানুষকে ভবিষ্যতে ইসলামের রাহবার ও আদর্শ ব্যক্তিত্বে রূপ দিতে পারে।
এই সাহাবিগণ ও সালফে সালেহীনগন প্রমাণ করেন যে শিশুকাল থেকেই যদি একজন মুসলিম ঈমানি পরিবেশে লালিত-পালিত হয়, তবে তিনি ইসলামের জন্য মহান অবদান রাখতে পারেন।

প্রথম দুই বছর

শৈশবের প্রথম দুই বছরই হলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ে তার ভিতরে শুদ্ধ চরিত্রের বীজ বপন, ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টি ও জীবন বিনির্মাণের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেয়া। এই স্তরে শিশু আপনার নড়াচড়া, ওঠা-বসার প্রতি খুব লক্ষ্য রাখবে। প্রথম বছরে তার অনুভূতিশক্তি জাগ্রত হবে না। দ্বিতীয় বছরের বেশ কিছু দিন পরই তার কথা-বার্তা ও কাজে-কর্মে সেগুলো প্রকাশ পেতে থাকবে। এ জন্য আল্লাহ তাআলার যিকির ও ইবাদতের জন্য দৈনন্দিনের রুটিন তৈরী করা। যেন শিশু এর উপর অভ্যস্ত হয়। আপনার থেকে দৈনন্দিন কিছু কিছু শুনে মুখস্থ করে নিতে পারে। তখন এটা তার প্রত্যহ জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হবে। এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

'তোমরা তোমাদের সন্তানদের নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হও। এবং তাদেরকে ভালো কাজে অভ্যস্ত কর। কেননা ভালো কাজ স্বভাবজাত একটি বিষয়।'

সন্তানদের জন্য বেশি বেশি দু'আ করা

সন্তানের জীবন গঠন ও তাদের সুন্দর পরিচর্যার জন্য দু'আর গুরুত্ব অপরিসীম। পরিচর্যা হবে দীর্ঘ মেয়াদী। কয়েক বছর ব্যাপী। এর জন্য মায়ের অনেক ধৈর্য ধারণ করতে হয়। বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হয়। শিশু লালন-পালনের ক্ষেত্রে আপনার অগ্রগামী হওয়া এবং আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে দু'আই হবে আপনার একমাত্র কার্যকরী সম্বল। সুতরাং আপনি দু'আর মাধ্যমে আপনার সন্তানের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে হেদায়েত প্রার্থনা করতে থাকবেন। কারণ সন্তান নেককার হওয়া এটা তো সম্পূর্ণ আল্লাহ তাআলার হাতে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

'আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত দিতে পারেন না বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন। আর হেদায়েতপ্রাপ্তদের ব্যাপারে তিনিই ভালো জানেন। সূরা কাসাস: ৫৬

অতএব হে প্রিয় মা! আপনার কর্তব্য হলো সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আল্লাহ প্রদত্ত মাধ্যমগুলো গ্রহণের প্রতি গুরুত্ব দেয়া। এরপর দুনিয়াবী মাধ্যম গ্রহণ করা। সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাড়া প্রদানের ব্যাপারে ধৈর্য্য ধারণ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

'আর যখন আমার বান্দাগণ আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয় তাদের নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে।'
সূরা বাকারাহ: ১৮৬

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্যতম একটি আদর্শ হলো তিনি শিশুদের জন্য খুব বেশি দু'আ করতেন, ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার জন্য দু'বার দু'আ করেছেন, যেন আল্লাহ তাআলা আমাকে হেকমত তথা প্রজ্ঞা দান করেন।

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার সন্তানের জন্য দুয়া করেছিলেন-

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء

'হে আমার রব! আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানান এবং আমার বংশদরদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের রব, আর আমাদের দু'আ কবুল করুন।' সূরা ইবরাহিম: ৪০।

এক বোন ও তার সন্তানদের গল্প

এক বোন সাদাসিধে এক মহিলার সাথে বসা ছিল। ঐ মহিলার দ্বীন সম্বন্ধে অল্প-স্বল্প জানা-শোনা ছিল। মহিলাটি ঐ বোনের কাছে তার সন্তানদের কথা বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, যখনই নমাযের সময় হয়, তার সন্তানগুলো কোনোরকম ডাক দেয়া ছাড়াই নামাযে দাঁড়িয়ে যায়। তখন ঐ বোন বললো, 'মাশাআল্লাহ! কিছু বলা ছাড়াই আপনার সন্তানরা নিজ আগ্রহে নামায আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে যায় এটা কিভাবে সম্ভব? মহিলাটি বললেন, তোমাকে বলার মতো আমার কিছুই নেই। তবে আমি বিবাহেরে আগ থেকে এমনকি আজকের এই দিন পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার কাছে ইবরাহিম নবির এই দু'আ পাঠ করতাম। দু'আটি হলো-

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

'হে আমার রব! আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানান এবং আমার বংশদরদের মধ্য থেকেও। হে আমারদের রব, আর আমাদের দু'আ কবুল করুন।' সূরা ইবরাহিম: ৪০

আরো কিছু দু'আ

এ ধরণের অনেক দু'আ রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হলো।

وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي
'আপনি আমার বংশধরদেরকে সংশোধন করে দিন।'সূ্রা আহকাফ: ১৫

وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

'আর আমি নিশ্চয় তাকে ও তার সন্তানদেরকে বিতাড়িত শাইতান থেকে আপনার আশ্রয়ে অর্পন করছি।' সূরা আল ইমরান: ৩৬

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

আর আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন।সূরা ইবরাহিম: ৩৫

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

'হে আমার রব! আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের রব, আর আমাদের দু'আ কবুল করুন।'সূরা ইবরাহিম: ৪০

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

'হে আমাদের রব! আমাদেরকে আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধরদেরকে আপনার অনুগত জাতি বানান। আর আমাদেরকে আপনার ইবাদতের বিধি-বিধান দেখিয়ে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সূরা বাকারাহ:১২৮'

এ ছাড়া আপনি নিজেও এ বলে দোয়া করতে পারেন, 'হে রব! আমার সন্তানদের শিষ্টাচার শিক্ষা দিন। কারণ আমি উত্তম শিষ্টাচার করতে জানি না। হে আমার রব! আপনি তাদের নেক কাজ আমাকে দান করুন এবং তাদেরকে সুন্দর মৃত্যু দান করুন। তাদেরকে আপনার দ্বীনী কাজে ব্যবহার করুন। তাদের অন্তরকে পরিবর্তন করবেন না। হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে কুরআনওয়ালা বানিয়ে দিন। তাদের চরিত্র মাধুরী কুরআনের রঙে রঙিয়ে দিন।'

উত্তম নমুনা

এখানে 'উত্তম নমুনা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পিতা-মাতা। তারাই হলেন সন্তানের প্রথম অনুসরণীয় ব্যক্তি। অন্য লোকের তুলনায় পিতা-মাতার গুণের প্রভাবে সন্তানেরা বেশি প্রভাবিত হয়। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন-'আমার মা বুঝ হওয়ার পর থেকেই সোমবার আর বৃহাস্পতিবারে রোযা রাখতেন।'

ফুযাইল ইবনু আয়ায রাহিমাহুল্লাহু বলেন, মালেক ইবনু দিনার রাহিমাহুল্লাহু এক লোককে নামায নষ্ট করতে দেখে বললেন, 'তার পরিবারের উপর আল্লাহ রহম করুন!' তখন তাকে বলা হলো, হে আবু ইয়াহইয়া! এ লোক তার নামায নষ্ট করছে আর আপনি তার পরিবারের জন্য রহমের দু'আ করলেন? তিনি বললেন, সে তাদের অনুকরণীয়। তারা তার থেকেই শিখবে।

আমরা এমন একটা সময় পাড় করছি, যে সময় অনেক পিতা-মাতাই শরয়ি জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ। তবে আল্লাহ যাদের উপর রহম করেন তারা ব্যতীত। এই শ্রেণীর লোক সন্তানদেরকে শিক্ষকের কাছে পাঠিয়েই ক্ষান্ত হয়ে আছে। আর তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে এ আশায় যে, তারা সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে বড় কিছু বানিয়ে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দিবেন।

এরপর যখন শিক্ষাকাল শেষ করে সন্তানরা ঘরে ফিরে, তখন তারা দেখতে পায়; তাদের সন্তানেরা শিক্ষক থেকে যা জেনেছে, বাস্তবে করছে তার উল্টো। তারা ঘরে বসে অহরহ ভুল কাজ করেও পিতা-মাতার কাছ থেকেও পাচ্ছে না কোনো দিকনির্দেশনা। আবার অনেক সময় সন্তানদের ভুল কাজ করতে দেখে পিতা-মাতা সংশোধন করতে অগ্রসর হয় তখন সন্তানেরা এই বলে তার নির্দেশনা উপেক্ষা করে যে, আপনারা নিজেরা যা করেন না, তা কেন আমাদের করতে বলেন?

অতএব পিতা-মাতার এই বিষয়গুলোর দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া উচিত। বিশেষ করে মায়ের শরয়ি জ্ঞান থাকা জরুরী। যেন তারা তাদের সন্তানদের জন্য কল্যাণকামী ও উত্তম আদর্শ হতে পারেন। এছাড়াও তারা হলেন সন্তানদের সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি। তাদের প্রভাবটাই সন্তানের উপর গভীরভাবে কাজ করে। সন্তান যখন ভুল করবে মা তাকে নববী আদর্শ ও শরয়ি দলিল দ্বারা তার ভুল শুধরিয়ে দিবেন। তাহলে এটা হবে প্রমাণ ভিত্তিক একটি সংশোধন এবং অবস্থান রক্ষাকারী একটি উপলব্ধি। সন্তানের সংশোধনের এই পদ্ধতিটাও হবে নববী মানহাজের অনুকরণ।

মা যদি অশিক্ষিত হন, সন্তান জন্ম দেয়ার আগেই উত্তম হলো দ্বীনি বিষয়গুলো শিখে নেয়া। যেন তিনি শিক্ষিত, দিকনির্দেশক ও আদর্শবান মা হতে পারেন। তিনি যা কিছু শিখবেন তা যেন তাদেরকে শিখাতে পারেন এবং উভয়ে একসাথে একই পথে চলতে পারেন। কেননা সন্তান পিতা-মাতাকে যা করতে দেখে তা-ই অনুসরণ করে। পিতা-মাতার কোন অবহেলা দেখতে পেলে সাথে সাথে সতর্ক হয়ে যায়। এক বোন এরূপ এক বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'তার প্রত্যেক নামাযের পর দু'আ-দরূদ পাঠ করার জন্য কিছু সময় বসার অভ্যাস ছিল। একদিন দু'আ না পড়েই নামাযের পর উঠে গেল। তখন তার ছেলে শিশুসুলভ ভাষায় এই বলে অপেক্ষা করলো: আম্মি! 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বললেন না যে!

অতএব, পিতা-মাতার কর্তব্য হলো নিজেদের দ্বীনদারী ও চরিত্র গঠনের প্রতি গুরুত্ব দেয়া। এবং এসব কিছু একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য করা। যেন এগুলো সন্তানের আচার-ব্যবহার ও চরিত্রের মাঝে ফুটে ওঠে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

'আর তাদের পিতা ছিল সৎ। 'সূরা:সফফাত:১০০

অবুঝ শিশুর এক আশ্চর্যজনক যোগ্যতা হলো তার আশপাশে যা কিছু ঘটে তা সবই সে কুড়িয়ে নেয় এবং স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করে রাখে। চাই সে এর অর্থ বুঝুক কিংবা না বুঝুক!

আবদ ইবনু আবী বকরাহ রাহিমাহুল্লাহু বলেন, 'আমি আমার পিতাকে বললাম, আবুব! আপনাকে প্রতিদিন সকালে কিছু বলতে শুনি? আপনি সকাল-সন্ধ্যা তিনবার করে বলেন। তখন তিনি বললেন, বেটা! আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এই দু'আগুলো বলতে শুনেছি। তাই আমি তার এই সুন্নাতটির অনুসরণ করতে পছন্দ করি।

সকাল-সন্ধ্যা শাইতান থেকে আশ্রয় চাওয়া:

শাইতান থেকে আশ্রয় চাওয়া হলো সন্তানদের সুরক্ষা করার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মিত হাসান-হুসাইনের সাথে করতেন, ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান-হুসাইনের জন্য শাইতান থেকে পানাহ চাইতেন এই বলে-

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامة

'আউযুবি কালিমাতিল্লাহিত তাম্মাহ, মিন কুল্লি শাইত্বনিও ওয়া হাম্মাহ, ওয়া মিন কুল্লি আইনিন লাম্মাহ'।

অর্থ:"আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর মাধ্যমে আশ্রয় চাই, প্রত্যেক শয়তান, ক্ষতিকর প্রাণী ও সকল কুদৃষ্টির অনিষ্ট থেকে।"
এরপর তিনি বলেন, তোমাদের পিতা এ দু'টি বাক্য দ্বারা ইসমাইল ও ইসহাক এর জন্য পানাহ চাইতেন।আস সুনান,ইমাম তিরমিযি:৩৩৭১

অতএব পিতা-মাতার জন্য আবশ্যক হলো, সর্বদা সন্তানদের রুকইয়াহর প্রতি গুরুত্ব দেয়া। বদ-নজর, হিংসা ও পিতা-মাতার অবহেলার কারণে সন্তানদের কত দুর্ঘটনাই ঘটে!

আল-আযকার বা দু'আ

শিশু এ স্তরে পৌঁছানোর পর তার জন্য মাসনূন দু'আ চর্চার একটি রুটিন তৈরী করা। এতে সে আমলের উপর অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। প্রতিটি দু'আর জন্য থাকবে নির্দিষ্ট একটি সময়। এতে দু'আগুলো মুখস্থ করা তার পক্ষে সহজ হয়ে যাবে। সবচে উত্তম পদ্ধতি হলো মা-বাবার মুখ থেকে তারা শোনবে এবং তাদের সামনে দৈনন্দিন দু'আগুলো পুনরাবৃত্তি করা। আপনি আশ্চর্যবোধ করবেন যখন দেখবেন, আপনার শিশু অল্প বয়স হওয়া সত্ত্বেও যখন সে ভালভাবে কথাও বলতে পারছেনা, অথচ ঐ দু'আগুলো মুখস্থ করে ফেলেছে। বার বার দু'আগুলো সে একা একাই মুখে আওড়নোর চেষ্টা করছে। এর কিছু পদ্ধতি নিম্নে তুলে ধরা হলো:

জাগ্রত হওয়ার সময় নবিজি যে দু'আ পাঠ করতেন:

সকাল-সন্ধ্যা শিশুর পার্শ্বে শয্যাসঙ্গী হওয়া এবং তার কানে ঐ দু'আগুলো বারবার পাঠ করে শুনানো। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন তখন এই দু'আ পাঠ করতেন-

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَهَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

'আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী আহইয়ানা বা'দামা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর।'
আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৬৩১২।

আর ঘুমুতে যাওয়ার সময় বলা-

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

| 'আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমৃতু ওয়া আহইয়া। '
আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৬৩১৪।

পানাহারের পূর্বে নবিজি যে দু'আ পড়তেন:

পানাহারের পূর্বে (দুধ পান করার পূর্বে) দু'আ পড়া। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل: بسم الله، فإن نسي أن يقول بسم الله في أوله، فليقل: بسم الله أوله وآخره.

যখন তোমাদের কেউ খাবার খায় সে যেন 'বিসমিল্লাহ' বলে নেয়। যদি শুরুতে পড়তে ভুলে যায় তাহলে মনে হওয়ার সাথে সাথে যেন বলে, 'বিসমিল্লাহি আউওয়ালাহু ওয়া আখিরাহ।' আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৭৬৭।

খাবারের পর নবিজি যে দু'আ পড়তেন:

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবারের পর বলতেন-

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ

আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আত্ব'আমানী ওয়া রযাক্বনী মিন গয়রি হাওলিম্ মিন্নী ওয়ালা ক্বুওয়াহ'। আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৩৪৫৮

হাঁচি দিয়ে যে দু'আ পড়বে:

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাঁচির ব্যাপারে বলেন, إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم.

—رواه الترمذي (حديث رقم(٢٧٤٧ :

তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয় সে যেন বলে, 'আলহামদুলিল্লাহ'। আর তার অপর ভাই বা সঙ্গী (যে হাঁচির আওয়াজ শুনেছে সে) যেন বলে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'। অতঃপর ইয়ারহামুকাল্লাহ-র জবাবে হাঁচিদাতা বলবে, 'ইয়াহদীকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম'।
আস সুনান, ইমাম তিরমিযি

কি চমৎকার কথা! হাঁচিদাতা 'আলহামদুলিল্লাহ বলবে, উত্তরদাতা বলবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ', হাঁচিদাতা এর উত্তরে 'ইয়াহদীকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম'। কেননা এগুলোই শিশুমনে গেঁথে যাবে। শুধু কি তাই! বরং 'আলহামদুলিল্লাহ' বলাই তো যথেষ্ট। সময়ের পালাক্রমে আপনার সন্তান আপনাদেরকে দেখে দেখে শিখে নিবে। রপ্ত করে ফেলবে আপনাদের মুখে শুনে শুনে।

আরোগ্য লাভের দু'আ:

সন্তানের শরীরের ব্যথাযুক্ত স্থানে মা-বাবার হাতের ছোঁয়া সত্যিই এক চমৎকার অনুভূতি। এর দ্বারা সে নিজেকে তাদের নিকটবর্তী মনে করবে। অনুভব করবে মমতা ও নিরাপত্তা। সাথে সাথে তার আরোগ্য লাভের দু'আ করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি যদি তার এমন কোনো মুসলিম ভাইকে রোগাক্রান্ত অবস্থায় দেখতে যায়, যার মৃত্যুক্ষণ আসেনি, সে তাকে সাত বার এই দুয়া করলে-

أَسْأَلُ اللهَ العَظِيمَ رَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

উচ্চারণ: আস্ আলুল্লাহাল আযীম, রাব্বাল আরশিল আযীম্ আইইয়াশফিয়াক।"

'আমি মহান আরশের রব মহামহিম আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ প্রার্থনা করছি, তিনি তোমাকে রোগ হতে সুস্থতা দান করুন'; তাকে রোগ মুক্ত করা হবে।আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২০৮৩।

আযান শ্রবণের সময় দু'আ:

মুয়াজ্জিনের সাথে সাথে আযানের শব্দগুলো পুনরাবৃত্তি করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে তার মন-মনন সতর্ক হয়। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول، فإذا قال حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
—المصنف لابن أبي شيبة (حديث رقم(٢٣٦٠ :

'মুয়াজ্জিন আযানের মধ্যে যা বলে, শ্রোতাও তাই বলবে। তবে 'হাইয়া আলাস সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ' এর ক্ষেত্রে বলবে, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'। মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা, হাদিস নং ২৩৬০।

আযান শ্রবণের পর দু'আ:

আযান শেষ হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য দু'আ করা।

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

'আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্দাওয়াতিৎ তাম্মাহ, ওয়াসসালাতিল ক্বয়িমাহ, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদীলাহ, ওয়াব আ'সহু মাকামাম্মাহমূদানিল্লাযী ওয়াদতাহ।' আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৪৭১৯।

তারপর এমন দু'আ করা, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা সকল সমস্যার সমাধান করে দেন। প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করা। তারপর পরিবার ও সাধারণ মুসলমানের জন্য দু'আ করা। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সাহাবাদেরকে বলেছেন-'আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী দু'আ কখনো ফিরিয়ে দেয়া হয় না।'

তখন সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তখন আমরা কি বলবো?

তিনি উত্তরে বললেন, 'তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তি কামনা কর।'

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দু'আ

আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কেউ ঘর থেকে বের হয় সে যেন বলে-

بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

“উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, লা হাওলা ওয়ালা ক্কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।”

তখন তাকে বলা হয়, আল্লাহ তাআলাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তুমি পথ পেয়েছো, রক্ষা পেয়েছো ও নিরাপত্তা লাভ করেছো। অতঃপর এক শাইতান অন্য এক শাইতান কে বলে, তুমি ঐ ব্যক্তিকে কি করতে পারবে যাকে পথ দেখানো হয়েছে। নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে এবং রক্ষা করা হয়েছে।
আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৩৫৯৪।

প্রতি বার উচ্চ স্বরে হলেও মাসনূন দু'আগুলো তার সামনে পাঠ করা। কারণ এরূপ শ্রবণের ফলে দু'আটি তার স্মৃতিপটে গেঁথে যাবে।

এক বোন বলেন, তিনি নিজে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এবং গাড়িতে আরোহণের সময় এ দু'আগুলো নিয়মিত পাঠ করতেন। যেন তার
সন্তানরা এগুলো মুখস্থ করে নেয়। কোন একদিন সে দেখলো তার সন্তান আড়াই বছর পূর্ণ না হতেই এ দু'আগুলো পরিপূর্ণরূপে বলতে পারে। অধিক পরিমাণে শোনার কারণে সে মুখস্থ করে নিয়েছে। অথচ এক সপ্তাহও অতিবাহিত হয়নি।

উল্লেখ্য, দৈনন্দিন দু'আর জন্য 'হিসনুল মুসলিম' গ্রন্থ থেকে আরো অনেক দু'আ বিস্তারিত জানা যাবে।

শিশুকে তাওহিদ শিক্ষা দেয়া:

কতই না সুন্দর হত! যদি আপনার শিশুর মুখে প্রথম কথাই হত তাওহিদের কালিমা। যদিও তার শব্দ উচ্চারণ হয় অস্পষ্ট ও ক্ষীনভাবে। এমন প্রত্যাশা আপনি তখনই করতে পারবেন, যখন সে আপনার মুখ থেকে কালিমাটি খুব বেশি শুনতে পাবে। আর তার সামনে এটা যত বেশি বলবেন, ততই দ্রুত সে তা রপ্ত করে নিতে পারবে।

ইবরাহিম আত-তাইমী রাহিমাহুল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শিশুর মুখে সর্বপ্রথম যেই কথাটি তারা শিক্ষা দিতে পছন্দবোধ করতেন তা হলো সাতবার **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ'। তখন এটাই হতো তার জীবনের প্রথম বাক্য।**
মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা, হাদিস নং ৩৫০০।

শিশুকে সর্বপ্রথম কালিমায়ে শাহাদাত শিক্ষা দেয়া আপনার পক্ষে অসম্ভব কিছু না। সে দুগ্ধপোষ্য থাকা অবস্থায়ই তার থেকে বারবার পুনরাবৃত্তি করার আবেদন করবেন। যদিও আপনি এটা জেনে থাকবেন যে, সে এখনো কথা বলতে শিখেনি।

ইবনু কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহু ছোট বয়সেই সন্তানদেরকে বিশেষভাবে তাওহিদ শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে বলতেন, যখন সন্তানের কথা বলার সময় হয় তখনই তাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' শিক্ষা দেয়া। তার কানে প্রথম আওয়াজই যেন আল্লাহ তাআলার পরিচয় ও তাওহিদ দিয়ে শুরু হয়। আল্লাহ তাআলা তো আরশের উপর থেকেই দেখবেন এবং তাদের কথা শুনবেন। তিনি তাদের সাথেই থাকেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন।

শিশুমনে আল্লাহ ও নবিজির ভালোবাসার বীজ বপন করা

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকবে, সে ঈমানের স্বাদ ও মিষ্টতা আস্বাদন করবে। গুণগুলো হলো:
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذف في النار.
—سنن النسائي (حديث رقم(٤٩٨٧ :

১. যার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সব কিছু অপেক্ষা বেশী প্রিয়।

২. যে আল্লাহ তাআলার জন্য ভালোবাসা রাখে এবং আল্লাহ তাআলার জন্য শত্রুতা পোষণ করে।

৩. ভয়াবহ আগুনে প্রজ্জ্বলিত হওয়া অধিকতর সহজ মনে হয় আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে অংশিদার সাব্যস্ত করা।'
সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৪৯৮৭।

এ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সন্তানদের হৃদয় ভূমিতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসার বীজ বপন করার শিশুকালই অধিক গুরুত্বপূর্ণ সময়। অবশ্য এর সবচে' সহজ পদ্ধতি হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা সমৃদ্ধ সুন্দর সুন্দর বাক্য বা সঙ্গীত তাদের নিকট খুব বেশি বেশি বলা। আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামের দ্বারাই আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পেয়ে থাকে। এ জন্য আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নাম বেশি বেশি শুনানো। যেমন, রাজ্জাক, ছামিউ', বাছীর, গফুর, শাকুর ইত্যাদি। সন্তানের সামনে বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার শুকর আদায় করা। এভাবে বলা,

* সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদেরকে খাদ্য ও পানীয় দান করেছেন।

* সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদেরকে বস্ত্র পরিধা করিয়েছেন এবং আমাদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।

* সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদেরকে সুস্বাস্থ্য করেছেন।

* সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করে অনুগ্রহ করেছেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে উপদেশ দিয়ে বলেছেন-

إِذَا أَكَلَ العَبْدُ الطَّعَامَ أَوْ شَرِبَ الشَّرَابَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْضَى عَنْهُ بِلَا شَكٍ.

যখন বান্দা খাবার খেয়ে কিংবা পানি পান করে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে তখন নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা বান্দার সন্তুষ্ট হয়ে যান। "
আস সহিহ, ইমাম মুসলিম: ২৭৩৪।

সে মুহুর্তটা কতইনা আনন্দময় হবে, যখন আপনার সন্তান আপনাকে দেখবে, আপনি আল্লাহ তাআলার নেয়ামত পেয়ে শুকর আদায় করার জন্য সিজদায় পড়ে আছেন।রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, যখন নবিজির নিকট কোনো আনন্দের বিষয় আসতো বা সুসংবাদ দেয়া হতো, তখন তিনি আল্লাহ তাআলার শুকর আদায়ের জন্য সিজদায় পড়ে যেতেন।আস সহিহ, ইমাম মুসলিম: ২৭৩৪।

উদাহরণত, তার পিতা মিষ্টিদ্রব্য জাতীয় কিছু আনলো অথবা সুন্দর খেলনা জাতীয় কোনো বস্তু আনলো। আপনি তার সামনে আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ!! অতঃপর আল্লাহ তাআলার শুকর আদায়ের জন্য সিজদায় চলে গেলেন। তখন আপনার সন্তান আল্লাহ তাআলার সম্পর্ক খুঁজে পাবে। সকল নিয়ামত পেয়ে তার প্রশংসা আদায়ে হবে সচেষ্ট।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের নিদর্শন হলো- পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছেদের ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া। বিশেষ ভঙ্গিতে আপনার সন্তানের সামনে মাসনূন দু'আগুলো পাঠ করা। যেমন, বলা হলো, খাবারের পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলো! আমাদের প্রিয় নবি আমাদেরকে এরূপ শিক্ষা দিয়েছেন।

ডান হাতে খাও! আমাদেরকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে শিখিয়েছেন।

চলো, আমরা নামায সময় মত আদায় করি! আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এ ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছেন।

মোটকথা, শিশুরা অল্প সময়েই সবকিছু আয়ত্ব করতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়; যা বড়রা পারে না। আপনার উচ্চারিত ঐ শব্দগুলোই সে মুখস্থ করে ফেলবে এবং তার স্মৃতিপটে গেঁথে যাবে। এভাবে সম্পর্ক হতে হতে একপর্যায়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা তার অন্তরে সবচেয়ে বেশি হয়ে যাবে।

শৈশবকাল: দুই বছর থেকে ছয় বছর পর্যন্ত

শিশুদের উপস্থিতিতে দু'আ করা:

নেক কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ ও হৃদয়ে নেককাজ বদ্ধমূল হওয়ার জন্য দু'আর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষকরে কোমলমতি শিশুর বেলায়। দু'আর মাধ্যমে কথা শুরু করা ও অভিনন্দন জানানো অসম্ভব সুন্দর একটি কাজ। কারণ এর দ্বারা তাদের অন্তরে আপনার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি পাবে। যেমন, আপনি তাদেরকে বললেন-আমাকে গ্লাসটি দাও, আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন!

আল্লাহ তোমাকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করুন! আমার চাদরটি নিয়ে এসো, আমি গায়ে জড়াবো।

তুমি কি দরজা বন্ধ করতে পারবে? আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করুন! এ ধরণের আরো অনেক দু'আ করা যেতে পারে।

এ ব্যাপারে বাস্তবমুখী অনেক সুন্দর-সুন্দর ঘটনা রয়েছে।

এক বোনের গল্প

এক বোনকে আল্লাহ তাআলা সাতজন সন্তান দান করেছেন। যারা অল্প বয়সেই কুরআন হিফজ সম্পন্ন করেছে। তাদের হিফয সম্পন্ন করার ব্যাপারে যখন তাদের মা-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন সে বললন, যখন তাদের কেউ কোনো ভালো কাজ করতো, তখন আমি তাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে তার জন্য দু'আ করতাম। আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন! তোমাকে হাফেযে কুরআনদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এই আশা করতাম যে, হয়তো কোনো এক সময় আল্লাহ তাআলার দরবারে আমার দু'আ কবুল হ যাবে। আল্লাহ তাআলার শোকর যে, আমার সবগুলো সন্তানই আজ কুরআনের হাফিয। আল্লাহ আমার উপর বিরাট অনুগ্রহ করেছেন।

সন্তানদেরকে বদ-দু'আ দেয়া যাবে না

এখানে সন্তানদেরকে বদ-দু'আ দেয়ার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিষেধাজ্ঞা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কেননা এসব কারণেই তারা নষ্ট হয়ে যায় ও তাদের হতভাগা হতে হয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-
"لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ."

"তোমরা নিজেদের জন্য বদ-দু'আ করো না, তোমাদের সন্তানদের প্রতি বদদু'আ দিও না, তোমাদের খাদেমদের জন্য বদ-দু'আ করো না এবং ধন-সম্পদের উপরও বদ দু'আ করো না। কেননা ঐ সময়টি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে কবুলের মুহূর্তও হতে পারে, ফলে তা কবুল হয়ে যাবে।" সুনানু আবি দাউদ: ১৫৩২।

বর্ণিত আছে-এক লোক আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহু এর কাছে এসে তার ছেলের অবাধ্যতার ব্যাপারে অভিযোগ করলো। তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি কি তাকে কখনো বদ-দু'আ দিয়েছো? সে বললো, হ্যাঁ। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বললেন-তুমিই তার জীবন নষ্ট করেছো।

সন্তানদেরকে দু'আ শিক্ষা দেয়া

যেমনিভাবে দু'আ সন্তানের অন্তরে যাদুর মতো কাজ করে; ঠিক তেমনিভাবে পিতা-মাতার এবং যিনি সন্তানকে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক করিয়ে দিবেন ও সকল বিষয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করার উপর পরিচর্যা করবেন; তার দু'আও অন্তরেও যাদুর মতো কাজ করে। সুতরাং দু'আ হলো ব্যাপক-বিস্তৃত একটি ইবাদত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

অর্থ :দুআই হলো ইবাদত।
সুনানে তিরমিযি:৩৩৭২

পবিত্র কুরআনুল কারিমে বর্ণিত হয়েছে-

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

'আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। নিশ্চয় যারা অহংকার বশতঃ আমার ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'সূরা গাফের: ৬০

সুতরাং, দু'বছর বয়স থেকেই শিশুকে নিজের জন্য দু'আ করতে শিখানো উচিত। এর পদ্ধতি হলো যখন আপনি দু'আ করবেন তখন সন্তানকে দু'আ মনোযোগের সহিত শুনানো এবং তাকে দু'আর পর 'আমিন' বলার জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন।

সন্তানের বয়স যখন চার বছরে উপনীত হবে, তার সাথে দু'আর গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা শুরু করবেন। তাকে বোঝানো উচিত, আল্লাহ তাআলা কখনো বান্দার দু'আ দ্রুত কবুল করেন, আবার কখনো বিলম্বে কবুল করেন। এর মধ্যে এমন হেকমত রয়েছে যা তিনি ছাড়া আর কেউই জানেন না। তবে তিনি আমাদের জন্য যেটা উত্তম সেটাই কবুল করেন। সাথে সাথে সন্তানকে দু'আ করার জন্য বারবার অনুশীলন করানো।

যেমন-

খাদ্য-দ্রব্য ক্রয় করার প্রয়োজন, আপনি তার কাছে দু'আ চাইবেন এই বলে যে, 'আল্লাহ যেনো তোমার আব্বকে ক্রয় করার তাওফিক দান করেন এবং ক্রয় করা তার জন্য সহজ করে দেন।' আবার আপনি তাকে শুনিয়েও দু'আ করবেন। তবে এ কাজটি মাসিক বেতন পাওয়ার দু-একদিন পূর্বে করতে হবে।

উঁচু আওয়াজে সন্তানের সামনে বলা, ' আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সম্পদ দান করলে, আমরা দান-খয়রাত করবো। প্রতিদিন সাথে নিয়ে দু'আ করা। এর কিছুদিন পর কিছু টাকা বের করে তাকে বলবেন, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাদেরকে কিছু টাকা দিয়েছেন। আমরা এগুলো দান করবো। আর ঐ টাকা যে, কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে দেয়ার জন্য তাকে উৎসাহ প্রদান করবেন।

সন্তান কোনো কিছুর আবদার করলে তাকে দু'আ করার জন্য পীড়াপীড়ি করা। মা হলে নিজ স্বামীকে এই বিষয়ে অবগত করা। যেন সে তার আবদার পূরণ করে। এগুলোর মাধ্যমে আপনার সন্তানের অন্তরে দু'আর মহত্ত্ব বুঝে আসবে। সেই সাথে তাকে ভালো কাজের জন্য তাওফিক লাভের দু'আ করতে অভ্যস্থ করা। দুনিয়া ও প্রবৃত্তি যেন এর সাথে সম্পৃক্ত না হয়।

এ সব কাজ তখনই সম্ভব হবে যখন আপনি আপনার সন্তানকে দু'আর প্রতি গুরুত্ব দিবেন। এখানে কিছু দু'আর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলো:

'হে আল্লাহ! আমি আপনার সাথে সাক্ষাত করার আগ্রহ প্রকাশ করছি এবং আপনার সুদর্শন চোহারার দিকে তাকানোর স্বাদ কামনা করছি।

হে আল্লাহ! আমার চরিত্র সুন্দর করে দিন যেমনিভাবে আপনি আমাকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে ক্ষমা করুন। তাদের
উপর রহম করুন। যেমন তারা ছোট সময়ে আমাকে লালন-পালন করেছেন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার যিকির, শুকর ও উত্তম ইবাদতের উপর সহযোগিতা করুন।

পিতা-মাতার জন্য শিশুকে দু'আ শিখানোর প্রতি গুরুত্ব দেয়া মূলত তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নামান্তর। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-আল্লাহ তাআলা যখন তার কোনো নেককার বান্দার মর্যাদা জান্নাতে উচু করবেন তখন সে বলবে, হে প্রতিপালক! এতো মর্যাদার অধিকারী আমি কিভাবে হলাম? তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে, কারণ সে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতো।

শিশুর আবদার পূরণ করার ক্ষেত্রে কখনো কখনো এরূপ কাজ করা, যেন সে দু'আ কবুল হওয়ার স্বাদ অনুভব করতে পারে। এতে আল্লাহ তাআলার সাথে তার সম্পর্ক গভীর হবে। সে আল্লাহ তাআলার প্রতি সর্বদা মনোনিবেশ করে থাকবে। তারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এতে সে এটাও শিখবে যে, দু'আ সাথে সাথেই কবুল হয় না। বরং অনেক সময় একটু দেরী হয় এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ বান্দাকে পরীক্ষা করেন। এ ধরণের বিষয়গুলোও ধীরে-ধীরে বুঝানো, যাতে দু'আর প্রতি বিরূপ ভাবনা তৈরী না হয়।

একটি ঘটনা

এক বোনের একজন সন্তান রয়েছে। বয়স মাত্র ছয়ের কোঠায় পৌঁছেছে। সন্তানটি চাচ্ছিলো তার আম্মু যেন ঘুমের সময় তার পাশে বসে। এ কথা ভেবে সে নিম্নস্বরে কাকুতি-মিনতি করে দু'আ করতে লাগলো। অতঃপর তার আম্মু অন্যান্য দিনের মতো না করে তার পাশে বসার জন্য। আসলো। হঠাৎ তার আম্মুকে দেখতে পেয়ে বলতে লাগলো আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমার দু'আ কবুল করেছেন। কারণ আমি আল্লাহ তাআলার কাছে খুব কাকুতি-মিনতি করে দু'আ করেছি, যেন তুমি আমার পাশে এসে বসো।

আল্লাহ তাআলার বিরাজমানতা অন্তরে সৃষ্টি করা:

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই একটা সময় আসে, যে সময় সে অন্যকে পরিপূর্ণরূপে বুঝে। তাকে অনুসরণ করে। তার অনুকরণ করে। তার প্রতি বিশেষ এক ভালবাসা কাজ করে। সে হিসেবে শিশু জীবনেও এমনটি হয়ে থাকে। তারাও মা-বাবার অনুকরণ করে থাকে। সে সময় যদি আমরা রবের প্রতি বেশী ভালবাসা দেখাই তারাও রবকে ভালবাসতে শুরু করবে। তাদের ভিতর রবের ভালবাসা রোপণ করার এটাই সবচেয়ে যথোপযুক্ত সময়।

শিশুর অন্তরে যখন আল্লাহ তাআলার ভালোবাসার বসতবাড়ী হবে এবং তার মন-মস্তিষ্কে আল্লাহ তাআলার ধ্যান ও তার প্রতি বিশ্বাসের চারা রোপিত হবে, তখন সে তার বাস্তব জীবনেও সেভাবেই গড়ে উঠবে। সে শিশু ভবিষ্যত হবে আদর্শ একজন পুরুষ কিংবা আদর্শবান একজন নারী।

শিশুর বয়স দু'বছরে পৌঁছলেই আল্লাহ তাআলার সাথে গভীর সম্পর্ক এবং আল্লাহ তাআলার ধ্যান উপলব্ধি করা শিশুর দেয়া যেতে পারে। বারবার তাকে কিছু উত্তম বাক্য শুনানো। এটা যেন তার স্মৃতিপটে পুঞ্জিভূত হয়। নিছক আবেগী না হয়। সময়ের পালাক্রমে সে রপ্ত করে নিবে। যেমন তাকে বললেন,

চলো, নামায পড়তে যাই। এতে আল্লাহ তাআলার সাথে আমাদের সাক্ষাত হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ভালোবাসবেন। জান্নাতুল ফেরদাউস দান করবেন।

আল্লাহ তাআলার সামনে লজ্জাশীল হও। তোমার গোপনাঙ্গ দ্রুত ঢেকে রাখ।

এতে সে অনেকটা আল্লাহ তাআলার ধ্যান উপলব্ধি করতে পারবে। আমরা আমাদের সন্তানকে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে লজ্জাশীল বানাবো। কেননা মুআবিয়া ইবনু হাইদাহ আল কুশাইরী থেকে বর্ণিত,

*عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: «فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْه.«ُ

সূত্র: سنن الترمذي، رقم الحديث٢٧٦٩ :

তিনি বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা আমাদের লজ্জাস্থান কতটুকু ঢেকে রাখব এবং কতটুকু খোলা রাখতে পারবো?

তিনি বললেন, তোমার স্ত্রী ও দাসী ছাড়া সকলের দৃষ্টি হতে লজ্জাস্থান হেফাযত করবে।

মুআবিয়া আবার প্রশ্ন করলেন, পুরুষেরা একত্রে অবস্থানরত থাকাকালেও?

তিনি বললেন, যতদূর সম্ভব কেউ যেন আবৃত স্থান দেখতে না পারে তুমি তা-ই করো।

তিনি বললেন, আমি আবারো প্রশ্ন করলাম, মানুষ তো কখনো নির্জন অবস্থায়ও থাকে। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা তো মানুষের চেয়েও লজ্জার ক্ষেত্রে বেশি হকদার।
আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২৭৬৯।

এ হাদিস থেকে এ কথাই বুঝা যায় যে, সন্তানের স্মৃতিপটে এ কথা গেঁথে দেয়া যে, আল্লাহ তাআলা সর্বদা আমাদেরকে দেখছেন।

এখন আপনি আপনার শিশুর কানে বেশি বেশি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম স্মরণ করবেন। তার কচি মনে রাসুল প্রীতির বীজ বপন করবেন। রাসুলের অনুকরণ ও প্রতিটি কাজে নববী আদর্শকে উত্তম নমুনা হিসাবে তার হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার এটাই উত্তম সময়। এর সাথে সাথে প্রতি সপ্তাহে তাকে একটি হাদিস ব্যাখ্যা সহ শিখিয়ে দেয়া। তাকে সপ্তাহব্যাপী উক্ত হাদিসের উপর আমল করানোর চেষ্টা করা। যেমন:

খানা খাওয়ার সময়।

যখন সে খানা খাবে তখন প্রতিবারই তাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন,

'হে বালক! বিসমিল্লাহ বলে খানা খাও। ডান হাতে খাও। তোমার সামনে থেকে খাও।'

আর যখন খাবারের কিছু অংশ পাত্রের বাহিরে পড়ে যায় তখন তাকে শিক্ষা দিন যে, সে অংশ সে কি করবে? তৎক্ষণাৎ তাকে স্মরণ করিয়ে দিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ বাণী।

إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ.

'তোমাদের কেউ যখন খাবার খায় আর তার লোকমা মাটিতে পড়ে যায়, তবে সে যেন লোকমার সাথে লেগে থাকা ময়লা দূর করে খেয়ে ফেলে। শয়তানের জন্য যেন তা রেখে না দেয়।'আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ১৮০২।

খাবার শেষ হওয়ার পর তাকে আঙ্গুলসমূহ চেটে খাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ

'তোমাদের কেউ যখন খাবার খায়, সে যেন তার আঙ্গুলগুলো চেটে খায়। কারণ সে জানে না খাদ্যের কোন অংশে বারাকাহ (কল্যাণ) রয়েছে। মুসলিম: ২০৩৫

এভাবে সে যখন প্রতিটি কথা ও কাজে সে বেড়ে উঠবে এবং অনুশীলন করবে যে, আমাদের প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে অনুকরনের মূল কেন্দ্র হলেন প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তখন আপনি দেখবেন যে, প্রতিটি নতুন নতুন পদক্ষেপে সে আপনাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে।

তাওহীদ শিক্ষা দেয়া:

নবিগণ তাদের সন্তানদেরকে তাওহীদ শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের মনোতুষ্টি ছিল যে, শিশু যখন একটু বড় হবে এবং তাওহীদের উপর প্রতিপালিত হবে তখন সে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপরই মৃত্যুবরণ করবে। তাই নবি ইবরাহিম ও ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাদের সন্তানদেরকে তাওহীদ আঁকড়ে ধরার ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন-

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

'আর ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার সন্তানদেরকে এবং ইয়াকুবকে (তাওহিদ এর) উপদেশ দিয়েছেন। হে আমার সন্তানেরা! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে চয়ন করেছেন। সুতরাং তোমরা মুসলিম হওয়া ছাড়া মৃত্যুবরণ করো না।' সূরা বাকারাহ:১৩২

ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তার সন্তানদেরকে বললেন-
تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

'ইয়াকুবের মৃত্যু যখন ঘনিয়ে এল, তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? যখন সে তাঁর সন্তানদেরকে বললো, আমার (মৃত্যুর) পর তোমরা কার ইবদাত করবে? তারা বললো, আমরা আপনার ইলাহের এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহিম, ইসমাইল ও ইসহাকের ইলাহের ইবাদাত করব। যিনি এক ইলাহ। আর আমরা তাঁরই অনুগত।'
সূরা বাকারাহ: **১৩৩**।

লোকমান আলাইহিস সালাম স্বীয় ছেলেকে বললেন-

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

'আর স্মরণ করুন ঐ সময়কে যখন লোকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলো, প্রিয় বৎস! আল্লাহ তাআলার সাথে শিরক করো না। নিশ্চয় শিরক হলো বড় যুলুম।'
সূরা লোকমান: **১৩**।

অনুরূপভাবে সালাফগণও এমন ছিলেন। আমর ইবনু কায়স আল-মালাহী রাহিমাহুল্লাহু বলেন- 'যখন তুমি কোনো যুবককে সর্বপ্রথম আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পথ ও মতের উপর বেড়ে উঠতে দেখবে তখন তুমি তার ব্যাপারে কল্যাণের আশা করতে পারো। আর যদি তুমি তাকে বেদআতিদের সাথে দেখতে পাও; তাহলে তার ব্যাপারে নিরাশ হতে পারো। কেননা যুবকরা সর্বপ্রথম যেই জিনিসের উপর বেড়ে উঠে সেটার উপরই অবিচল থাকে।'

অতএব, হে জননী! আপনার উপর আবশ্যক হলো এই স্তরে যখন আপনার শিশু পৌঁছবে, বিশেষকরে তিন বছর বা তারচে' একটু বেশী হলেই তার কানে আল্লাহ তাআলার তাওহীদ বিষয়ক ঘটনাবলী বেশী-বেশী পুনরাবৃত্তি করা। অনুরূপভাবে ছোট-ছোট এমন কিছু ঘটনা তাকে শুনানো, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলার সত্তাগত ও গুণবাচক নাম তার নিকট স্পষ্ট হয়ে যায়। সাথে-সাথে তাকে এগুলো শিক্ষা দেয়া ও সংহতকরণের জন্য ভিন্ন কোনো পন্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। প্রখ্যাত মুফাসসির শাইখ সা'দী রাহিমাহুল্লাহু বলেন-'প্রজ্ঞা হলো ইলমের মাধ্যমে দাওয়াত দেয়া, অজ্ঞতার মাধ্যমে নয়।'

মোটকথা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দিয়ে কাজ শুরু করা। কেননা এটা স্মৃতিপটে ধরে রাখার এক অনুপম মাধ্যম।

শিশুদেরকে মাসনূন দু'আ ও তাওহীদ শিক্ষা দিবেন কিভাবে, এ ব্যাপারে সুন্দর একটি ঘটনা আছে।

আম্মু! কেন আমরা জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলাম না?

একটি কন্যা শিশু আছে। তার বয়স এখনো তিন বছর হয়নি। সে তার আম্মুর পিছনে দাঁড়িয়ে; ফ্রক বা গাউন পেঁচিয়ে তোতলামীপনা শব্দে বলছে, আম্মু, আম্মু! কেন আমরা জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলাম না?

তখন তার আম্মু তার চতুর্পার্শ্বে ঘিরে থাকা সন্তানদের সামনে বসলেন। (যাদের বয়স দেড় বছর থেকে দশ বছর পর্যন্ত) তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য বিশেষ আসর বসালেন।

আম্মু সন্তানদেরকে নিয়ে সূরা ইখলাস পাঠ করা শুরু করলেন। সবাই দশবার পড়লো। অতঃপর তারা আনন্দের সহিত কণ্ঠ মিলিয়ে আওয়াজ করে বললো, 'আল্লাহ তাআলার প্রশংসা যে, আমরা জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেছি।'
এরপর মা তার সন্তানদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এ ঘরে কি রাখতে চাও? সন্তানরা এক কণ্ঠে উত্তর দিলো, আম্মু! রত্নভাণ্ডার। তারা "লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বলতে শুরু করলো।

তারপর পুনারায় তার আম্মু তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আগ্রহী যে, ফেরেশতারা তার জন্য মাগফেরাত করবে? এ কথা শুনে তারা সকলেই বলতে শুরু করলো, 'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়ালা আলি মুহাম্মদ, কামা সাল্লাইতা আলা ইবরহিমা ওয়ালা আলি ইবরাহিম..।

এরপর তারা তাসবীহ, তাহলীল ও তাকবীর বলতে লাগলো। এগুলো শেষ করে যার যার কাজ ও খেলা-ধুলায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

দেখুন! মা তার সন্তানদেরকে তার প্রতি ভালোবাসা ও তার সাথে বসার আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য কিভাবে সময় দিলেন। তাদেরকে শিক্ষা দিলেন এবং আল্লাহ তাআলার যিকিরের উপর অভ্যস্ত করলেন। তার এ কথার সূত্র হলো

"من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتًا في الجنة

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ বাণী- 'যে ব্যক্তি 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' শেষ পর্যন্ত ১০ বার পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতে এক মহল নির্মাণ করেন। '
আল মুসনাদ, ইমাম আহমাদ: হাদিস নং ১৫৬১০।

আরেক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনু কায়সকে লক্ষ্য করে বললেন, يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، قُلْ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ.

হে আবদুল্লাহ ইবনু কায়স! তুমি পড়বে 'লা হওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'। কারণ এ দু'আ হলো জান্নাতের রত্নভাণ্ডার।
আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৬৩৮৪।

অনুরূপভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
"من صلى عليَّ، لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى عليَّ، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر".

, যে আমার উপর যত দরূদ পাঠ করবে, ফেরেশতারা তার জন্য ততবার ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবেন। সুতরাং বান্দা চাহে তো কম করুক বা বেশি করুক।
আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হাদিস নং ১৬৬৯।

মা তার সন্তানদেরকে উপরোক্ত দু'আগুলো এমন এক অসাধারণ পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলেন; যা তারা খুব সহজেই রপ্ত করে নিতে সক্ষম হলো।

প্রথমে ঈমান শিখানোর প্রতি গুরুত্ব দেয়া:

সালাফে সালেহীন সন্তানদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি যেই জিনিসের গুরুত্ব দিয়েছেন সেটা হলো, কুরআন মুখস্থ করানোর পূর্বেই তাদেরকে হালাল-হারাম, আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ শিক্ষা দেয়া। ফলে শিশু আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে বেড়ে উঠবে। তাঁর আদেশ পালন ও নিষেধ পরিত্যাগ করার পূর্ণ মানসিকতা তাদের ভিতর কাজ করবে। প্রথমেই শরয়ি ইলম শিক্ষা করার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, পূর্ণ কুরআন হিফয করা। বরং যে কোনো আয়াত মুখস্থ করার পূর্বে সে ঐ আয়াতে বর্ণিত বিধি-নিষেধ শিখে নিবে। তাহলে এটা তার স্মৃতিপটে ঈমানের ভীত সুদৃঢ়করণের মজবুত এক মাধ্যম হবে। অতঃপর পরবর্তী আয়াতের দিকে যাওয়া। এর অর্থ শিখে নেয়া। এর প্রয়োগ পদ্ধতি জেনে নেয়া। তারপর মুখস্থ করার পদক্ষেপ নেয়া।

জুন্দুব ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

جُندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: "كنَّا معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ونحنُ فِتيانٌ حَزاوِرَةٌ، فتعلَّمنا الإيمانَ قبلَ أن نتعلَّمَ القرآنَ، ثمَّ تعلَّمنا القرآنَ فازدَدْنا به إيمانًا".
]سنن ابن ماجه، حديث رقم[52 :

'আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছিলাম। আমরা ছিলাম শক্তিশালী ও টগবগে যুবক। তখন আমরা কুরআন শেখার পূর্বে ঈমান শিখেছি। তারপর আমরা কুরআন শিখেছি। ফলে আমাদের ঈমান আরো বেড়ে গিয়েছে। 'আস সুনান, ইমাম ইবনু মাজাহ, হাদিস নং ৫২।

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "مَرَّ عَلَيْنَا زَمَانٌ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ، فَتَعَلَّمْنَا الإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، فَفِيمَا نَحْنُ فِي ذَٰلِكَ إِذَا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةٌ أَمَرَنَا بِهَا فَتَعَلَّمْنَا حَلَالَهَا وَحَرَامَهَا وَأَمْرَهَا وَنَهْيَهَا وَمَا فِيهَا، فَإِنِّي رَأَيْتُ قَوْمًا يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّمُوا إِيمَانَهُمْ فَيَحْفَظُونَ سُورَةَ الْفَاتِحَةِ وَمَا بَعْدَهَا فَيَحْفَظُونَ حَرَامَهَا وَحَلَالَهَا وَأَمْرَهَا وَنَهْيَهَا وَمَا فِيهَا."

আমাদের উপর দিয়ে এমন একটা সময় অতিবাহিত হয়েছে যে, আমাদের কুরআন শেখার পূর্বে ঈমান শিখতে হতো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর কোনো সূরা অবতীর্ণ হলে আমরা তার হালাল-হারাম, আদেশ-নিষেধ এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরো যা কিছু জানা যায় আমরা শিখে নিতাম। যেমন তোমরা কুরআন মাজীদের সূরা শেখো। আমি অনেক লোককে দেখেছি তাদেরকে ঈমান শেখানোর পূর্বে কুরআন শিখানো হয়। তারা সুরা ফাতিহা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত পড়ে। কিন্তু এর হালাল-হারাম, আদেশ-নিষেধ এমনকি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অতিরিক্ত কিছু অবগত হওয়া যায় এমন কিছু শিখে না। তারা নিম্নমানের খেজুর ছিটানোর ন্যায় ছিটিয়ে দিচ্ছে।'
ইবনু মান্দাহ: হাদিস নং ১০৬।

কুরআনের আয়নায় তাদের জীবন প্রতিপালিত হওয়া আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ এক নেয়ামত। শুধু কি তাই! এটা হলো শ্রেষ্ঠ নেয়ামত যা প্রতিটি মা-ই কামনা করে, যেন আল্লাহ তাকে উত্তম নেয়ামত দান করেন। সে এই কুরআন মুখস্থ করে আল্লাহ তাআলার প্রিয় ও নিকটতম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

শিশু বয়সেই কুরআন মুখস্থ করিয়ে দেয়া:

শিশু বয়সে কুরআন মুখস্থ করা অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। এতে অনেক উপকার রয়েছে। যেমন:

১. শিশু মন কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত হবে। তার মধ্যে কুরআনের ভালোবাসা জন্মাবে। কুরআনের সাথে যখন তার সম্পর্ক তৈরী হবে এবং আয়াতের উপর সে যখন চোখ মেলে তাকাবে, তখন সে কুরআনের চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে।

২. তার প্রতিভা বিকশিত হবে। মেধাশক্তি শাণিত হবে। কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষা ব্যবস্থা এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, যেসব শিক্ষার্থীরা কুরআনের হাফিয, তারা পড়াশোনায় অন্যদের তুলনায় অনেক এগিয়ে থাকে।

৩. যবান সঠিক হয়। বাকশক্তি সুন্দর হয়। হরফের মাখরাজ বিশুদ্ধ হয়। ভাষাগত সম্পদ বৃদ্ধি পায়। যেমন-শব্দতত্ত, অর্থবিদ্যা ও বিভিন্ন বাগধারা ইত্যাদি।

৪. ছোট বয়সেই যারা কুরআন মুখস্থ করে অর্থ বোঝে, তারা তো আল্লাহ প্রদত্ত নূর ও হেদায়েতের ছায়ায় প্রতিপালিত হয়। শয়তানের সামনে প্রবৃত্তির সকল দরজা এবং গোমরাহীর সকল পথ বন্ধ করে দেয়।

৫. পিতা-মাতার জন্য সন্তান হলো উর্বর ভূমি। তারা সেখানে কল্যাণের যে বীজই বপন করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে এর ফসল ভোগ করতে পারবে। সন্তান যখনই কুরআন তিলাওয়াত করবে পিতা-মাতা তার তিলাওয়াতের কারণে উত্তম প্রতিদান লাভ করবে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ

'আমিই তো মৃতকে জীবিত করি আর লিখে রাখি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে এবং যা পিছনে রেখে যায়। আর প্রতিটি বস্তুকেই আমি সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি।'
সূরা ইয়াসিন: ১২।

সন্তান পরিচর্যার ক্ষেত্রে সালাফদের রীতি ছিল, ছোট বয়সেই সন্তানদেরকে হাফিয বানিয়ে দেয়া।

ইবরাহিম ইবনু সাযীদ আল-আনসারী বলেন, 'আমি একদিন চার বছর বয়সী একটি বালককে খলিফা মামুনুর রশীদের দরবারে নিয়ে আসতে দেখেছি। সে খলিফার দরবারে কুরআন তিলাওয়াত করলো। কিন্তু সে ক্ষুধার তাড়নায় কান্না শুরু করে দিল।

ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহু বলেন, 'আমি সাত বছর বয়সে কুরআন মুখস্থ করেছি। আর মুয়াত্বা মুখস্থ করেছি দশ বছর বয়সে।'

কাজী ইস্পাহানী রাহিমাহুল্লাহু বলেন, 'আমি পাঁচ বছর বয়সে কুরআন মুখস্থ করে ফেলেছি।'

দুই বছর বয়স থেকেই আপনি আপনার শিশুকে সূরা নাস থেকে মুখস্থ করানো শুরু করে দিতে পারেন। সাথে সাথে সহজভাবে এর ব্যাখ্যাও শুনিয়ে দিবেন। ঐ বয়সে তাকে মুখস্থ করানোর জন্য বিকল্প পন্থাও অবলম্বন করতে পারেন! যেমন-কম্পিউটারে অন্য কারো অথবা আপনার নিজেরই তিলাওয়াত ছেড়ে দিলেন, আর সেটা কয়েকবার করেও হতে পারে। কেননা শিশুরা সাধারণত এই বয়সে এক জায়গায় বসা বা স্থিরতা পছন্দ করে না বরং খেলাধুলার ছলে বিশেষ পদ্ধতিতে শ্রুত বিষয় মুখস্থ করার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। অনুরূপ আপনার পাশে বসিয়ে খেলার ছলে কোন আয়াত বা সূরা বার বার তাকে শুনাতে পারেন। তাহলে দেখবেন সে অজান্তেই আপনার সাথে বারবার জপে আয়ত্ত করে ফেলবে।

শিশুর বয়স তিন বছর হলে আপনি তার সাথে পুনরাবৃত্তি পঠন পদ্ধতি শুরু করে দিবেন। আর চার বছর হলে তাকে সাথে নিয়ে বসে সহজভাবে কুরআন তিলাওয়াত করবেন। বার বার তার সামনে বলতে থাকুন।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হলো শিশুকে মুখস্থ করানোর কৌশল অবলম্বন করা। এ ব্যাপারে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। এক মা তার সন্তানদের জন্য এমন একটি দোলনা

নির্ধারণ করেছে, যার উপর তারা কেবল মুখস্থের সময় এসে বসে। আরেকজন পিতা তার সন্তানকে নিয়ে মুখস্থের সময় বের হতো। তখন তার হাতে হেড ফোনসহ মোবাইলে দিতো। ঘরের প্রয়োজনে বাহিরে যেত। এদিক দিয়ে ছেলেটি তিলাওয়াত শুনত আর কারী সাহেবের তিলাওয়াতের পর সেও বলতে থাকতো। তবে দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করা এখনকার সময়ে বেশ দুরহ ব্যাপার।

শিশুকে আল্লাহ তাআলার যিকিরের জন্য উদ্বুদ্ধ করা:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ".

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সুবহানাল্লি ওয়াবিহামদিহী' একশত বার পড়বে, তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়।' আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৬৪০৫।

খেলাধুলা ও আনন্দ-ফুর্তি করার সময়ও তাকে এই তাসবীহগুলো শিক্ষা দিতে পারেন। আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-আমরা একবার এক যাত্রায় আমাদের পিতার সাথে সফররত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, আমরা ঐ গাছ পর্যন্ত যেতে যেতে তোমরা সুবাহনাল্লাহ বলো। তখন আমরা সকলেই ঐ গাছ পর্যন্ত পৌঁছাতে পৌঁছাতে 'সুবহানাল্লাহ' বলতে লাগলাম। এরপর যখন আরেকটি গাছ দেখা গেল তখন তিনি বললেন, ঐ যে গাছটি দেখা এর সামনে পৌঁছানো পর্যন্ত 'আল্লাহু আকবর' বলো। আমর আকবর বলতে থাকলাম। এভাবে তিনি আমাদের সাথে এমন থাকলেন।

ঘুমের পূর্বে শিক্ষণীয় গল্প শোনানো:

পরিচর্যার গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম হলো গল্প। গল্প বলার মাধ্যমে পরিচর্যা করা যায়। দিনের বেলা অথবা যে কোনা সময়ই গল্প বলা যায়। তবে ঘুমের পূর্বে এবং মাসনূন দু'আর পর গল্প বলা বেশি কার্যকর। সময়টি অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর ও আকষণীয়। এতে মায়ের সাথে সন্তানের অতিরিক্ত একটা সম্পর্ক ও বন্ধন তৈরী হয়। তাছাড়া ঘুমের সময় গল্প বলা শিশুকে ঘুমের জন্য প্রস্তুত করতে সহায়তা করে। শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটায়। তার কল্পনা ও সৃজনশীলতাকে প্রাণবন্ত করে তুলে। শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন, চরিত্র ও ধর্মীয় মূল্যবোধ তৈরী করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে উত্তম গল্পকে বিবেচনা করা হয়। জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, ঘটনাবলী হলো আল্লাহ তাআলার সৈন্য। এর দ্বারা মুরীদদের অন্তর শক্তিশালী হয়। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার কাছে কি এর কোনো প্রমাণ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহ তায়লার বাণী-

.وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

'আর রাসূলদের এ সকল সংবাদ আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করছি যার দ্বারা আমি তোমাদের মনকে স্থির করি, আর এতে তোমার কাছে সত্য এবং মুমিনদের জন্য উপদেশ ও স্মরণ।সুরা হুদ: ১২০।

অতএব, শিশুর দুই বছর বয়স হলেই ঘুমের পূর্বে সহজ সরল শব্দে গল্প বলা শুরু করুন। দশ মিনিটের বেশি সময় নিবেন না। যেন এর মধ্য দিয়েই তার কিছু কিছু শিষ্টাচার শেখা হয়ে যায়।

শিশুর বয়স তিন বা চার বছর হলে তাকে নবিদের ঘটনা শুনানো শুরু করুন। যেন এর দ্বারা সে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ, নিদর্শনাবলী, কুদরত ও মহানুভবতার ব্যাপারে পরিচয় লাভ করতে পারে। কাফিরদের বিরুদ্ধে নবিদের দাওয়াত, সাহায্য ও ধৈর্য্য সম্পর্কেও অবগত হতে পারবে।

এরপর আমাদের প্রিয় নবির সীরাত শুনান। যেন নবিজির প্রতি শিশুর আগ্রহ তৈরী হয়। নবি কে? তার আদর্শ কী তা জানতে যেন সে অনুরাগী হয়। তাছাড়া নিয়মিত যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে শুনতে থাকবে এবং তার আখলাক অনুসরণ করবে

তখন সে তার সম্পর্কে, মুসলমানদের কৃতিত্ব ও ফযিলত এবং ইসলামের উদারতা ও সহনশীলতা সম্পর্কেও জানতে পারবে।

তারপর আস্তে আস্তে সাহাবা, খুলাফায়ে রাশেদীন, উম্মাহাতুল মু'মিনীন, নারী সাহাবি ও তাবেয়ীদের জীবন কাহিনী শুনাবে।

অপ্রীতিকর কোনো কিছু ঘটার সময়:

যখন অপ্রীতিকর কোনো কিছু ঘটবে বা কোনো কাজে পরাভূত হবেন তখন বলবেন, 'আল্লাহ তাআলা যা নিদিষ্ট করেছেন এবং যা চেয়েছেন তাই করেছেন'। হাদিসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ,

"الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ " لَوْ " تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ."

অনুবাদ: আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

“শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিন অপেক্ষা আল্লাহর নিকট উত্তম ও অধিক প্রিয়। তবে উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। যা তোমার উপকারে আসে, তা অর্জনের চেষ্টা করো এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো। আর অক্ষম হয়ো না। যদি তোমার উপর কোনো বিপদ আসে, তাহলে বলো না, ‘যদি আমি এমন করতাম, তাহলে এমন হতো।’ বরং বলো, ‘আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন, এবং তিনি যা চান তা-ই করেন।’ কেননা ‘যদি’ শব্দটি শয়তানের কাজের দরজা খুলে দেয়।”

আস সহিহ, ইমাম মুসলিম: ২৬৬৪।

অসৎ লোকের সংশ্রব থেকে বিরত থাকা

শিশুরা এই বয়সে এসে বিদ্যালয়ের ভিতরে কিংবা বাহিরে সমবয়সীদের সাথে সম্পর্ক তৈরী করে। যেটা তাদের উপর ঘরোয়া পরিবেশের তুলনায় বেশি প্রভাব ফেলে। এ কারণে পিতা-মাতার উপর আবশ্যক হলো, সন্তানকে দিকনির্দেশনা দেয়া এবং ভালো বন্ধু নির্বাচন করতে সহযোগিতা করা। অসৎ বন্ধু থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা। শিশুর ব্যক্তিত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন সৎ সঙ্গ নির্বাচনের প্রতি গুরুত্ব দেয়া। যেন সে আহলে ইলম ও নেককার লোকদের এড়িয়ে না চলে। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

»الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِل«ُ
-السنن الترمذي٢٣٧٤ :

মানুষ তার বন্ধুর ধর্ম অনুযায়ী চলে।
আস সুনান, ইমাম তিরমিযি:২৩৭৪

সুতরাং তোমাদের সকলেই যেন দেখে নেয় সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে!

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُঅন্যত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-
قَالَ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السُّوءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَة«ً

অর্থ:আবূ মূসা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উপমা হলো আতরওয়ালা ও কামারের হাপরের মতো। আতরওয়ালা হয়তো তোমাকে আতর উপহার দেবে, অথবা তুমি তার কাছ থেকে আতর কিনবে, অথবা তার সান্নিধ্যে থেকে সুবাস পাবে। আর কামারের হাপর হয়তো তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, অথবা তুমি তার কাছ থেকে কুৎসিত গন্ধ পাবে।"সহিহ মুসলিম:২৬২৮

এ কারণেই সালাফগণ তাদের সন্তানদের পিছনে থাকার ব্যাপারে বেশ গুরুত্ব দিতেন এবং সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহযোগিতা করতেন,

ইবরাহিম আল-হারবী রাহিমাহুল্লাহু বলেন-"তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে বিপদে নিপতিত হওয়ার পূর্বে অসৎ বন্ধু থেকে দূরে রাখ।'

এক ব্যক্তি বলেন, 'সন্তান সর্বপ্রথম নষ্ট হয় সঙ্গদোষে।'

আবু হাতেম রাহিমাহুল্লাহু বলেন-আমি আহমাদ ইবনু সিনানকে বলতে শুনেছি, যখন কোনো ব্যক্তি বেদআতী লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তখন আমি মনে করি তার পক্ষে যদি সম্ভব হয় তাহলে সে যেন তার ঘর বিক্রি করে দেয় এবং পরিবর্তন করে ফেলে। অন্যথায় তার সন্তান প্রতিবেশি ধ্বংস হবে।

মা'মার রাহিমাহুল্লাহু বলেন, আমি এক জলাশয়ের কাছে ইবনু তাউসের সঙ্গে ছিলাম। সালেহ নামক এক ব্যক্তি এসে তার সঙ্গে তাকদীর নিয়ে কথা বললো। তিনিও তার সঙ্গে কথা বলতেছিলেন। একপর্যায়ে তাউস তার আঙ্গুল কানের ভিতরে ঢুকিয়ে তার ছেলেকে বললো, তুমিও ভালোভাবে তোমার কানে আঙ্গুল দিয়ে রাখ। যেন তার কোনো কথা তুমি শুনতে না পারো। কেননা মানুষের অন্তর বড়ই দুর্বল।

নেককার আহলে ইলমের সাহচর্য গ্রহণ করা

শিশুকে যেমনিভাবে অসৎ বন্ধু থেকে দূরে রাখা গুরুত্বপূর্ণ; তেমভিাবে নেককার আহলে ইলমের সাহচর্যে নিয়ে যাওয়াও গুরুত্বপূর্ণ। যেন তারা তাদের অনুসারী ও অনুকরণকারী হতে পারে। বিশেষকরে আমাদের এই যুগে, যে সময়ে চতুর্মুখী ফেতনা আমাদেরকে গ্রাস করে নিচ্ছে।হাদিসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
»إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ، يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ، قَالَ: فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ: مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالَ: يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ، وَيُكَبِّرُونَكَ، وَيَحْمَدُونَكَ، وَيُمَجِّدُونَك...
(হাদীস দীর্ঘ; শেষাংশ:)

فَقَالَ: هُمُ الْقَوْمُ، لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُم.

আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
“আল্লাহর কিছু ফেরেশতা আছেন, যারা পথেঘাটে ঘোরাফেরা করেন, যিকিরকারীদের অনুসন্ধানে। তারা কোনো গোষ্ঠীকে আল্লাহর যিকির করতে দেখলে বলে, ‘তোমরা যাদের খুঁজছিলে তারা এখানেই আছে।’ তারপর তারা তাদের ডানা দিয়ে তাদের পরিবেষ্টন করে

এবং আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়... (আল্লাহ তাআলা বলেন) – তারা এমন একটি জাতি, যার পাশে বসলে কেউ হতভাগা হয় না।”

আস সহিহ, ইমাম মুসলিম: ২৬৮৯।

লোকমান হাকিম স্বীয় ছেলেকে লক্ষ্য করে বললেন-'বেটা! উলামাগণের মজলিসে হাঁটু গেড়ে বসো। কেননা আল্লাহ তাআলা হেকমতের নূর দ্বারা বান্দার অন্তর পুনরুজ্জীবিত করেন। যেমনিভাবে আকাশের বৃষ্টি দ্বারা যমিনকে উর্বর করেন।'

মসজিদ ও শরয়ি বৈঠকেও সন্তানকে নিয়ে যাওয়া মুস্তাহাব। কেননা এ দুটোই উত্তম জায়গা। এখান থেকেই চেনা যায় আহলে ইলম ও নেককার লোকদেরকে।

সুরক্ষা থাকার দু'আ শিখানো:

শাইতান ও যাবতীয় ক্ষতিকর বস্তু থেকে শিশুর সুরক্ষার জন্য মাসনূন দু'আর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। সে এখন যে বয়সে পৌঁছেছে এ সময়ে মাসনূন দু'আর গুরুত্ব নিজেই উপলব্ধি করবে। এবং সে নিজে নিজেই তা পুনরাবৃত্তি করতে সক্ষম হবে।

আমর ইবনু শুয়াইব তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ভীতিকর পরিস্থিতিতে এ বাক্যগুলোর মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করা শিক্ষা দিতেন।

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ، وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ

' আউযুবি কালিমাতিল্লাহিত-তাম্মতি মিন গদ্বিবিহি ওয়া ইক্বিবিহি ওয়া শাররি ইবাদিহি ওয়া মিন হামাযাতিশ শাইয়াতিনি ওআই ইয়াহদ্বুরুন।'

অর্থাৎ-আল্লাহ তাআলার পূর্ণ কালিমা সমূহ দ্বারা তাঁর আযাব, গযব, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট ও শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং আমাদের নিকট তার উপস্থিতি হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ বাক্যগুলো তার বালেগ সন্তানদের ঘুমের সময় শিখাতেন আর নাবালেগদের গলায় ঝুলি দিতেন।

ইবনু আবিদ দুনিয়া রচিত আল ইয়াল ২/৮৬১

সন্তানকে গান বাজনা থেকে দূরে রাখা:

সাহাবী ও তাবেয়ীদের ভাষ্য অনুযায়ী বহু গুনাহর সমষ্টি হল গান ও বাদ্যযন্ত্র। যথা :

ক) নিফাক এর উৎস

খ) ব্যভিচারের প্রেরণা জাগ্রতকারী

গ) মস্তিষ্কের উপর আবরণ

ঘ) কুরআনের প্রতি অনিহা সৃষ্টিকারী

ঙ) আখিরাতের চিন্তা নির্মূলকারী

চ) গুনাহের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিকারী ও

ছ) জিহাদী চেতনা বিনষ্টকারী।-ইগাছাতুল লাহফান ১/১৮৭

বস্তুত গান বাজনার ক্ষতিকর প্রভাব এত বেশি যে, তা নাজায়েয হওয়ার জন্য আলাদা কোনো দলীল খোঁজার প্রয়োজন পড়ে না। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বহু হাদীসের মাধ্যমে তা প্রমাণিত।

গান-গায়িকা এবং এর ব্যবসা ও চর্চাকে হারাম আখ্যায়িত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-لকোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, এর সকল উপার্জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুযায়ী সম্পূর্ণ হারাম। لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন, وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ

আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে। আর তাদের মাথার উপর বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকা রমনীদের গান বাজতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যমীনে ধ্বসিয়ে দিবেন।-সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস : ৪০২০; সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস : ৬৭৫৮

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, পানি যেমন (ভূমিতে) তৃণলতা উৎপন্ন করে তেমনি গান মানুষের অন্তরে নিফাক সৃষ্টি করে।-ইগাছাতুল লাহফান ১/১৯৩; তাফসীরে কুরতুবী ১৪/৫২

উপরোক্ত বাণীর সত্যতা এখন দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার। গান-বাজনার ব্যাপক বিস্তারের ফলে মানুষের অন্তরে এই পরিমাণ নিফাক সৃষ্টি হয়েছে যে, সাহাবীদের ইসলামকে এ যুগে

অচল মনে করা হচ্ছে এবং গান-বাদ্য, নারী-পুরুষের মেলামেশা ইত্যাদিকে হালাল মনে করা হচ্ছে। সহীহ বুখারীতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,"لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ، وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ".আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশম, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল সাব্যস্ত করবে।-সহীহ বুখারী হাদীস : ৫৫৯০ মুসনাদে আহমদের হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

আল্লাহ তাআলা আমাকে মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন এবং বাদ্যযন্ত্র, ক্রুশ ও জাহেলি প্রথা বিলোপসাধনের নির্দেশ দিয়েছেন।

হাদীসের আলোয় সাহাবীদের জীবন

দু'একটি ক্ষেত্রে শুধু দফ বাজানোর বিষয়টি ব্যতিক্রম থাকলেও যে কোনো বাদ্যযন্ত্রই হারাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস এবং সাহাবীদের বাস্তব আমল তা প্রমাণ করে।

বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত নাফে' রাহ. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার চলার পথে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বাঁশির আওয়াজ শুনলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুই কানে আঙ্গুল দিলেন। কিছু দূর গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে নাফে'! এখনো কি আওয়াজ শুনছ? আমি বললাম হ্যাঁ। অতঃপর আমি যখন বললাম, এখন আর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না তখন তিনি কান থেকে আঙ্গুল সরালেন এবং বললেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলার পথে বাঁশির আওয়াজ শুনে এমনই করেছিলেন। -মুসনাদে আহমদ হাদীস : ৪৫৩৫; সুনানে আবু দাউদ হাদীস : ৪৯২৪ বিখ্যাত তাবেয়ী মুজাহিদ রাহ. থেকেও এমন একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।-ইবনে মাজাহ হাদীস : **১৯০১**

একটু ভেবে দেখুন তো, যে আওয়াজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম মুহূর্তের জন্যও কানে তুলতে রাজি ছিলেন না সেই ইবলিসী আওয়াজের অনুকূলে কথা বলার দুঃসাহস আমরা দেখাতে পারি কি না?

বাজনাদার নুপুর ও ঘুঙুরের আওয়াজও সাহাবায়ে কেরাম বরদাশত করতেন না। তাহলে গান ও বাদ্যযন্ত্রের প্রশ্নই কি অবান্তর নয়? নাসাঈ ও সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত আছে, একদিন হযরত আয়েশা রা.-এর নিকট বাজনাদার নুপুর পরে কোনো বালিকা আসলে আয়েশা রা. বললেন, খবরদার, তা কেটে না ফেলা পর্যন্ত আমার ঘরে প্রবেশ করবে না। অতঃপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا جرس

যে ঘরে কুকুর বা ঘণ্টি থাকে সেই ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।-সুনানে আবু দাউদ হাদীস : ৪২৩১; সুনানে নাসাঈ হাদীস : ৫২৩৭ সহীহ মুসলিমে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, إِنَّ الْجَرَسَ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ

ঘণ্টি, ঘুঙুর হল শয়তানের বাদ্যযন্ত্র।-সহীহ মুসলিম হাদীস : ২১১৪ মৃদু আওয়াজের ঘণ্টি-ঘুঙুরের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আধুনিক সুরেলা বাদ্যযন্ত্রের বিধান কী হবে তা খুব সহজেই বুঝা যায়।

চার ইমামের ভাষ্য :

গান ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ.-অভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। সকলেই গান-বাদ্যকে হারাম বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইমাম মালেক রাহ. কে গান-বাদ্যের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, কেবল ফাসিকরাই তা করতে পারে।-কুরতুবী ১৪/৫৫ ইমাম শাফেয়ী রাহ. বলেছেন যে, গান-বাদ্যে লিপ্ত ব্যক্তি হল আহমক।

তিনি আরো বলেন, সর্বপ্রকার বীণা, তন্ত্রী, ঢাকঢোল, তবলা, সারেঙ্গী সবই হারাম এবং এর শ্রোতা ফাসেক। তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।-ইগাছাতুল লাহফান ১/১৭৯; কুরতুবী ১৪/৫৫ হাম্বলী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ আল্লামা আলী মারদভী লেখেন, বাদ্য ছাড়া গান মাকরূহে তাহরীমী। আর যদি বাদ্য থাকে তবে তা হারাম।-আহসানুল ফাতাওয়া ৮/৩৮৮

ইমাম শাফেয়ী রাহ. শর্তসাপেক্ষে শুধু ওলীমা অনুষ্ঠানে দফ বাজানোর অবকাশ আছে বলে মত দিয়েছেন। কেননা বিয়ের ঘোষণার উদ্দেশ্যে ওলীমার অনুষ্ঠানে দফ বাজানোর অবকাশের বর্ণনা হাদীসে রয়েছে।-জামে তিরমিযী হাদীস : ১০৮৯; সহীহ বুখারী হাদীস : ৫১৪৭, ৫১৬২ মনে রাখতে হবে, এখানে দফ বাজানোর উদ্দেশ্য হল বিবাহের ঘোষণা, অন্য কিছু নয়।-ফাতহুল বারী

মোবাইল ফোনের অপব্যবহার:বর্তমান সময়ে ইন্টারনেট এবং মোবাইলের অবাধ ব্যবহার নতুন প্রজন্মের চরিত্র ও ঈমানকে এমনভাবে দেউলিয়া করে দিচ্ছে, যা প্রকাশ করার মতো কোন ভাষা নেই। কলম যেন নীরব হয়ে গেছে। বিবেক হারিয়ে গেছে। যেসব পিতা-মাতা সন্তানদেরকে মোবাইল ও ইন্টারনেটের খোলা ময়দানে ছেড়ে দিয়েছে তারা মূলত সন্তানদেরকে ধ্বংস করার সরঞ্জাম তার হাতে তুলে দিয়েছে।মাওলানা তাকী উসমানী দা. বা. বলেন- 'বর্তমান সময়ে স্মার্ট ফোন হলো সবেচেয় বড় ফিতনা'। অথচ আমাদের নতুন প্রজন্ম

এই স্মার্ট ফোন গলায় ঝুলিয়ে অবাধ চলা-ফেরা করে। এই ফোন যেন তার নিঃসঙ্গ জীবনের সাথী। মোবাইল স্ক্রিনে ভেসে আসা দূষিত সাইট এবং চরিত্র নষ্টকারী দৃশ্য ঘরের পরিবেশকে সমূলে বিনাশ করে দিচ্ছে।

সুতরাং নিজ সন্তানদেরকে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখবেন। যদি খুব বেশি প্রয়োজন হয় তাহলে নিজেদের বিশেষ তদারকিতে ব্যবহার করাবেন। কেননা সন্তানেরা ঐ সমস্ত কাজ গোপনে করে, যেগুলো তারা অসৎ মনে করে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে মোবাইলের ফিতনা থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

ভিডিও গেমস:

সন্তান ধ্বংস হওয়ার আরেকটি বড় কারণ হলো ভিডিও গেমস। বর্তমান সময়ে ভিডিও গেমসের স্বাধীন ব্যবহার সন্তানদেরকে একেবারে বেপরোয়া করে রেখেছে। এটা অস্বীকার করার কোন সুযোগই নেই। ভিডিও গেমস সন্তান, যুবক, এমনকি বড়দেরও অনিবার্য নেশায় পরিণত হয়েছে। পিতা-মাতারা স্বাভাবিকভাবে ভিডিও গেমসকে একটা বিনোদনমূলক বিষয় মনে করে থাকেন। সময় অতিবাহিত করার জন্য সন্তানদের হাতে ভিডিও গেমস দিয়ে ব্যস্ততার মধ্যে ডুবিয়ে রাখেন। এখন ভিডিও গেমস এতো পরিমাণে বেড়ে গেছে যে, সব শ্রেণীর লোকেরা এর দ্বারা প্রভাবিত। তাদের সকাল-সন্ধ্যা অতিবাহিত হয় এই ভিডিও গেমস খেলে।অধিকাংশ সন্তানেরা যখন ঘরে কম্পিউটার, ল্যাপটপের মধ্যে বুদ হয়ে থাকে তখন অসচেতন পিতা-মাতা এই ধারণা রাখে যে, সন্তান হয়তো ভালো লাইনেই তা ব্যবহার করছে। অথচ সে ব্যবহার করছে অসৎ জায়গায়। ধারণা করা হয় যে, আগামীর বিশ্ব ভিডিও গেমসের লীলাভূমিতে পরিণত হবে। এই গেমস খেলতে গিয়ে কত শিশু যে আত্মহত্যা করেছে এর সঠিক কোন সংখ্যা আমার জানা নেই। বর্তমানে কিছু ধ্বংসাত্বক গেমস বের হয়েছে। যেমন- পাবজি, ফ্রী ফায়ার, এ জাতীয় আরো অনেক গেমস রয়েছে। ছোট ছোট সন্তানরা এগুলোর প্রতি আসক্ত হয়ে খাওয়া-দাওয়া, ঘুম-নিদ্রা সব কিছু বিসর্জন দিচ্ছে। এমনকি এ নিয়ে মা-বাবার সাথে মারামারি করতেও দ্বিধাবোধ করছে না। তাই পিতা-মাতার জন্য কর্তব্য হলো, সন্তানদেরকে এই ভুল পথ থেকে দূরে রাখা। তাদেরকে ভালো বইয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা।

শিশুকে ইন্টারনেট থেকে দূরে রাখা:

আধুনিক শিক্ষা সহজ হওয়ায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো ইন্টারনেটের ধারা এই জন্য শুরু করেছিল যে, শিক্ষার্থীরা যেন খুব সহজেই জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অর্জন করতে পারে। নিঃসন্দেহে তথ্য অর্জন করার অতুলনীল একটি মাধ্যম ইন্টারনেট। তবে অসৎ জায়গায় এর ব্যবহারটাই তুলনামূলক বেশি দেখা যাচ্ছে। শাইতান ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা ইন্টারনেটের অপব্যবহার শুরু করে দিয়েছে। এর মাধ্যমে ছেলে-মেয়ে একে অপরের সাথে হারাম ভালোবাসা বিনিময় করার জন্য চেটিং (বার্তা নিবেদন) করে। বর্তমান সময়ে ফেসবুকে হাজারের অধিক বন্ধু বানানোকে গৌরবের বিষয় মনে করা হয়। অথচ এর বেশির ভাগই থাকে ফেক আইডি। খুব মজা নিয়ে একজন অপরজনের সাথে কথা বলে। অধিকাংশ পিতা-মাতা ধরে নেয় যে, আমার সন্তান সদা সর্বদা পড়া-লেখায় ব্যস্ত থাকে। তার তো খবর নেই যে, সে কম্পিউটারের স্ক্রিনে ঘন্টার পর ঘন্টা নিজ প্রেমিকার সাথে ভালোবাসায় মত্ত হয়ে আছে। এই রোগে কেবল যুবকরাই সীমাবদ্ধ নয়। অনেক ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও এর ভুক্তভোগী। সেও যুবতী মেয়েদের সাথে এভাবে বার্তা বিনিময় করে। যেমন প্রেমিক প্রেমিকার সাথে করে থাকে।

এ কারণেই ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম, টুইটার এ জাতীয় এ্যাপসগুলোর মধ্যে এই পরিমাণ অসৎ জিনিস যুক্ত থাকে, যা পড়লে বা দেখলে অন্তরের মৃত্যু হয়ে যায়। ইন্টারনেটে ইসলামিক ওয়েবসাইড থাকে। আবার ইসলামের বিপক্ষে কাজ করার জন্য ইয়াহুদী, খ্রিষ্টানদের লোকজনও কুরআন-হাদিসের মধ্যে বিভিন্ন রদ-বদল করে লেখা শেয়ার করে। অনেক সময় এমন লোভও দেখায় যে, এই পরিমাণ লোকদের কাছে শেয়ার করতে পারলে তোমার মোবাইল ব্যালেন্সে এত টাকা চলে আসবে।

অন্যদিকে যুব সমাজ ইন্টারনেটে বিভিন্ন বিষয়ে পড়া-শোনা করে এবং ভিডিও দেখে মনে করে যে, এগুলো ধর্মীয় বিষয়। অথচ ইসলামের সাথে এর নূন্যতমও কোন সম্পর্ক নেই। মোটকথা বুঝা গেল যে, ইন্টারনেট যতটুকু উপকারী তার থেকে ক্ষতির দিকটাই বেশি। এজন্য সন্তানদের ব্যাপারে মা-বাবার সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যে, তারা যেন অপরিপক্ক অবস্থাতেই ইন্টারনেটের অপব্যবহারে জড়িয়ে না পড়ে।

রাগ হলে কি করবেন?

রাগ প্রতিটা মানুষের মধ্যেই আছে। কারো মধ্যে বেশি, কারো মধ্যে কম। তবে রাগকে যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেই হলো সবচেয়ে বড় বীর। সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে আমাদের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। অন্যথায় হীতে বিপরীত হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছ। প্রচণ্ড রাগের মাথায় আমরা অনেক সময় অনেক কিছুই বলে ফেলি, যেমন- আপনি রাগ করে বললেন, মর তুই। ফেরেশতা বলল, 'আমিন'। অথবা বললেন, তোর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ফেরেশতা বলল 'আমিন'। আপনি রাগ করে বললেন, তোর মুখ আমি দেখতে চাই না। ফেরেশতা বলল 'আমিন'।

আপনি রাগ করে বললেন, জীবনে স্বামীর ভাত খেতে পারবি না, ফেরেশতা বলল, 'আমিন'।
আপনি রাগ করে বললেন, মরার সময় তুই পানি পাবি না। ফেরেশতা বলল, 'আমিন'।
আপনি রাগ করে বললেন, তুই এবার ফেল নিশ্চিত। ফেরেশতা বলল,আমিন'। আপনি রাগ করে বললেন, আমার মৃত মুখ দেখবি। ফেরেশতা বলল, 'আমিন' আপনিই তো সেই মানুষ, যে সন্তানকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। জীবনে এর চেয়ে বেশি ভালো কাউকে বাসেননি এমনকি নিজেকেও না।

আপনিই তো সেই মানুষ, যার চেয়ে আন্তরিক দু'আ এই পৃথিবীতে তার জন্যে কেউ করবে না। এমনকি সে নিজেও না।

স্বাভাবিকতই মুসলমানের সব কথার শেষে ফেরেশতাগণ আমিন আমিন বলেন। আর সন্তানের জন্য বাবা-মা'র মুখ থেকে বের হওয়া প্রতিটি শব্দ খুব শক্তিশালী। আসুন এর মর্যাদা বুঝি। এর অপব্যবহার না করি।

হ্যাঁ, সন্তান অন্যায় করেছে। মা-বাবা হিসেবে এ ধরনের অশ্লীল ভাষা ব্যবহার না করে আসুন বলি, আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত দিন। আমার জন্য চক্ষু শীতলকারি বানান। অথবা বলতে পারেন-

আল্লাহ তোমাকে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মত বানান।
আল্লাহ তোমাকে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর মত বানান।
আল্লাহ তোমাকে কাবা ঘরের ইমাম বানান। আল্লাহুম্মা আমিন!

রাগের সময়ও আমাদের এ জাতীয় কথা বলা। অভিশাপ দেয়া কিংবা এ জাতীয় কথা-বার্তা অনেক সময় কবুল হয়ে যায়। যখনই নিজের ভিতর রাগ উপলব্ধি করবেন বা বুঝবেন রাগ উঠে যাচ্ছে অথবা মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে, তখন শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচার জন্য 'আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম' মনে মনে পড়তে থাকবেন। দেখবেন, নিজের প্রতি নিজের নিয়ন্ত্রণ চলে আসবে ইনশাআল্লাহ।

বাবা-মা'র কোন আচরণগুলো গ্রহণযোগ্য নয়?

১. সন্তান কোনো ভুল করলে তা যদি স্বীকারও করে, তাও তাকে ভুলের জন্য সারাক্ষণ বকাঝকা করা ও পরবর্তীতে ঐ ভুলের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে খোঁটা মারা। এতে সন্তান পরবর্তীতে কোন ভুল করলে জানাবে না। লুকাবে বা মিথ্যা কথা বলবে এটা সে করেনি।
২. অন্য মানুষের সামনে নিজ সন্তানকে মারধর করা ঠিক নয়। এতে সন্তানের আত্মসম্মানবোধ ক্ষুন্ন হয়। অথবা সবসময় একটা ভয়-ভীতি তার ভেতর কাজ করে।
৩. কঠিন নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে বেঁধে দিয়ে তা পালন করতে সহায়তা না করা। অথচ চালচলন নিয়ম মতো না হলে শুধু শাস্তির বিধান রাখা।
৪. শুধু কড়া শাসনে রেখে নয়; সন্তানকে মাঝে মাঝে বুকে টেনে নিয়ে আদর করে বলা যে, আপনি তাকে কতটা ভালোবাসেন। এরকম না করলে সন্তানের সাথে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হবে।
৫. সন্তান তার যে কোন নাজুক সময়ে সহানুভূতি চায়। অনেক সময় মানসিক চাপ কাটাতে সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। বাইরে যেকোন বৈরী পরিস্থিতি হোক। হোক তা স্কুলের পরীক্ষা বা বন্ধুদের বিরূপ আচরণ। সন্তান সব সময় চায় কেউ তাকে সান্ত্বনা দিক বা সাহস যোগাক। এ কাজে বাবা-মা'কেই এগিয়ে আসতে হবে।
৬. সবচেয়ে মারত্মক ভুল হলো, অন্য সন্তানদের সাথে বা অন্যের সন্তানদের সাথে তুলনা করা। এতে তার নিজের গুণাবলিগুলো চাপা পড়ে যায়। তার ব্যক্তিত্বও গড়ে ওঠে না।
৭. কোন রুটিন ছাড়া এলোমেলো জীবন সন্তানকে সঠিক ভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে না। নিজের কাজ নিজে গুছিয়ে কর শেখালে বড় হয়ে সন্তানকে কর্মক্ষেত্রে বা সংসার জীবনে চলতে বিপদে পড়তে হয়।
৮. সন্তানের ছোট ছোট সাফল্যকে প্রশংসা না করলে বা বা পুরস্কৃত না করলে তার গুণগুলো অংকুরেই বিনষ্ট হয়। ভালো কাজে নিরুৎসাহিত বোধ করে।

৯. সন্তানের ইচ্ছেগুলোকে প্রাধান্য না দিলে বা যে কাজে তার উৎসাহ বেশী সেটা তাকে করতে বাধা দিলে অথবা অপছন্দের কিছু বেছে নিতে বাধ্য করা হলে সে কখনোই জীবনে সফল হতে পারবে না।
১০. বেশী সুরক্ষিত রাখতে যেয়ে সব সময় চোখে চোখে রাখা। চোখের আড়াল হতে না দেয়া এবং তার ব্যক্তি স্বাধীনতায় অধিক হস্তক্ষেপ করাও কিন্তু ঠিক নয়। এতে সন্তান পরনির্ভরশীল হয় এবং নিজের দায়িত্ব নিজে সম্পাদিত করতে অপারগ হয়।

১১. সন্তানকে কোয়ালিটি টাইম অর্থাৎ সন্তানের প্রতি নিরবিচ্ছিন্নভাবে মনোযোগ দিয়ে তার সঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু সময় না দেয়া অথবা তার সামনে নিজেকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপনে ব্যর্থ হওয়াও সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাল না হবার একটি অন্যতম কারণ।

১২. সন্তানকে কোন দায়িত্ব দিতে আস্থা না পেলে বা তার সামর্থ্যকে সন্দেহ করা হলে সে কখনোই স্বাবলম্বী হতে পারবে না।

১৩. সর্বোপরি, প্রয়োজনের সময় সন্তানের কোনো অন্যায় কাজকে শাসন না করে উল্টো তাকে সমর্থন করা, প্রশ্রয় দেয়া ও সন্তানের উপর অন্ধ বিশ্বাস করে তার দোষগুলোকে লুকানো অনেক ক্ষেত্রেই ভবিষ্যতে বিপদ ডেকে আনে এবং এগুলো জীবন সংশয়ের কারণও হতে পারে।

বাবা-মায়ের সঠিক দিকনির্দেশনা না পেলে কি হয়?

বাবা-মায়ের সঠিক দিকনির্দেশনা যদি সন্তান না পায় তাহলে তার মধ্যে যেসব লক্ষণ দেখা যায় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. অসামাজিক হয়।

২. সহজে নিজের আবেগ, রাগ ও অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ। এবং অকারণে ঝগড়া ও মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে।

৩. বিষন্নতা ও আত্মহত্যা প্রবণ হয়।

৪. উশৃঙ্খল ও উগ্র আচরণকারী হয়।

৫.অন্যদের সাথে ভালো আচরণে ও সহানুভূতি না দেখাতে ব্যর্থ হয়।

৬. সম্পর্কে জড়ানোর চেয়ে ভাঙতেই বেশি আগ্রহী হয়।

৭. বার বার বিশ্বাস ভঙ্গ হবার কারণে নিজের পরিবারের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে ব্যর্থ ও বৃদ্ধ পিতামাতাকে বর্জনকারী হয়।

সঠিকভাবে সন্তান পালনের উপায়:

১. সন্তানের জীবনের সব ছোট বড় পরিবর্তন ও ঘটনার খোঁজ রাখা এবং নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বা উদাহরণ দিয়ে সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালিত করা।
২. কখনোই নিয়ন্ত্রণ হারাবেন না ও রেগে গিয়ে চিৎকার করবেন না।
৩. সন্তানের কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিলে কেন ও কি আশা করছেন তার কাছ থেকে অবশ্যই তাকে বুঝিয়ে বলুন।
৪. নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন এবং তাকে তা মানতে সহায়তা করুন।
৫. সন্তানকে স্বাধীনতা সে কি চায়। আপনার সাথে না মিললে তাকে বুঝিয়ে বলুন, আপনি কি চাচ্ছেন।
৬. তার জন্য উত্তম আদর্শ হওয়ার চেষ্টা করুন। আপনি নিয়ম মেনে চললে, ব্যবহার ভালো করলে অথবা কোন অন্যায় আচরন করলে সন্তান আপনাকে দেখেই শিখে ফেলবে।
৮. সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে, সন্তান কি বলতে চায় তার মনের ভাবগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনুন। তার সবকথার মনোযোগী শ্রোতা হিসেবে সময় দিন। ভালো সন্তান পেতে হলে আগে নিজে ভালো পিতামাতা হওয়ার চেষ্টা করুন। একতাল কাদামাটির মতো সন্তানকে কি গড়বেন তা আপনারই হাতে।

কাজের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস অর্জন:

আত্মবিশ্বাস এমন একটি গুণ, যেটার উপর ভর করে মানুষ খুব সহজেই সাফল্য অর্জন করতে পারে। একটা মানুষের জন্য আত্মবিশ্বাসী হওয়া আবশ্যকীয় বিষয়। আর এই আত্মবিশ্বাসটাই প্রতিটা মানুষের ছোট কাল থেকেই বাড়ানো দরকার। সন্তানকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলার জন্য বাবা-মাকেই সাহায্যকারী হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

কাজের মাধ্যমেও আত্মবিশ্বাস অর্জন করা সম্ভব। সন্তানদেরকে ছোট ছোট কাজ শিখিয়েও কিন্তু আত্মবিশ্বাস বাড়ানো যায়। তাদের বয়স অনুযায়ী সামর্থ্য মতো কাজ ভাগ করে দিতে হবে।যার মাধ্যমে সন্তান নিজের প্রতি আস্থা রাখতে শিখবে।

এছাড়াও নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ছোটবেলা থেকেই একজন শিশুকে শেখানো উচিত:

তার আগে সন্তানদের যা শেখানো হয়-

১. আত্মনির্ভরশীলতা।

২. আত্মবিশ্বাস।

৩. সুরক্ষা পদ্ধতি ও শিষ্ঠাচার

৪. সর্বশেষে পড়ালেখা।

পড়ালেখা কিন্তু সবার শেষে প্রাধান্য পাচ্ছে। সন্তানরা যখন স্কুলে যাবে তখন কিন্তু পড়ালেখা একটা বয়স ঠিকই শিখে যাবে। আর সন্তান যখন আত্মবিশ্বাসী এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে তখন তাদের জন্য পড়ালেখা শেখাটা আপনা-আপনি-ই সহজ হয়ে উঠবে। আর সাথে সাথে কিছু সুরক্ষা পদ্ধতি ও শিষ্ঠাচারও শেখানো।

তারা কিভাবে এই ছোট ছোট সন্তানকে আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল করে তুলছে। সন্তানগুলোকে নিজের ছোট ছোট কাজ গুলো আগে শেখানো হচ্ছে। যেমন-নিজের হাতে খাওয়া। নিজের জুতা, জামা, প্যান্ট নিজেই পরিধান করা। এই যে নিজের কাজ নিজে করে তারা যখন আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠছে, তখন কিন্তু তারা আপনা-আপনিই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে। আর যখন আত্নবিশ্বাসী হয়ে উঠছে তখন কিন্তু ওদের দ্বারা সব কাজ করাই সম্ভব হয়ে যাচ্ছে।

সুরক্ষা পদ্ধতি ও শিষ্ঠাচার শিক্ষা এই দুটো কাজের মাধ্যমে সন্তান মানুষের সাথে ভদ্রতার সহিত মিশতে পারা শিখবে। কখনো কোন বিপদ আসলে কিভাবে নিজেকে মোকাবেলা করতে হয় তা শিখবে। যা আমায় জীবনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য খুবই আবশ্যক। যেমন-বড়দের সাধে কেমন আচরণ হবে। কারো সাথে দেখা হলে কিভাবে সম্ভাষণ করতে হবে, ভালো মন্দের পার্থক্য বুঝিয়ে বলা ইত্যাদি। যেমনিভাবে এরকম শিষ্ঠাচার শেখানো হয়, ঠিক তেমনিভাবে বিভিন্ন বিষয়ের সুরক্ষা পদ্ধতিও শেখানো হয়। যেমন, কোথাও কেটে গেলে

ব্যান্ডেজ লাগাতে হয়। পুড়ে গেলে আক্রান্ত স্থানে ঠান্ডা পানি বা বরফ দিতে হয়। আগুন লাগলে কিভাবে নিজেকে রক্ষা করতে হয়, ইমার্জেন্সিতে কিভাবে কল দিতে হয় ইত্যাদি। এরকম বিভিন্ন সুরক্ষা পদ্ধতি সন্তানদের ধারনা দেয়া হয়।
তারপর আসে পড়ালেখা শেখানোর বিষয় নিয়ে। খেলার ছলে শেখানো এবং একেবারেই অল্প অল্প করে শেখানো। যেমন, একদিনে শুধু দুইটা শব্দ শেখানো। আবার যে বইটা পড়াচ্ছে সেই বইয়ের চরিত্রগুলো ছেলে মেয়েদের মধ্যে ধারন করে দেয়া। যেন ওরা আগ্রহী হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্যি, আমরা অভিভাবকরা উল্লেখিত প্রথম তিনটিকে বাদ দিয়ে চার নাম্বারটাতে ঝাপিয়ে পড়ি। সরাসরি বই দিয়ে জোর করে পড়তে বসাতে চাই। যার দরুণ সন্তানগুলো আগ্রহ-ই হারিয়ে ফেলে। তাইতো সন্তানদের মনোযোগ আনতে এতো কষ্ট হয়। সন্তানগুলোকে আগে জানাতে হবে কিভাবে আনন্দ নিয়ে শিখতে হয়। তাহলে তারা এমনিতেই মনোযোগী হয়ে উঠবে। আর পড়া-লেখা শেখার আগেও যে অনেক কিছু শেখার আছে সেটা সম্পর্কেও তাদের জানাতে হবে। আত্মনির্ভরশীল ও আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলাটাও যে পড়ালেখা শেখানোর মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটাও বুঝতে হবে।

বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী আচারণগুলো পরিহার করা:
এখান থেকে দেখে নিন, আপনাদের পরিবারে এই সমস্যাগুলো আছে কিনা? আজ থেকেই নিজেদেরকে পরিবর্তন করে ফেলুন। তাহলে আপনার আগামী দিনটি সুন্দর কাটবে।
(১) আপনারা স্বামী-স্ত্রী কি সন্তানদের সামনে ঝগড়া-ঝাটি করেন?
(২) আপনারা কি একে অপরকে রাগের মাথায় গালাগালি করা বা জিনিসপত্র ভাঙ্গেন?
(৩) আপনারা স্বামী-স্ত্রী কি সন্তানদের সামনে মিথ্যা কথা বলেন?
(৪) আপনারা কি একজন আরেক জনের বদনাম সন্তানদের নিকট বা অন্যের নিকট করেন?
(৫) আপনারা কি প্রতিবেশী বা আত্মীয়-স্বজনের গীবত করেন?
(৬) আপনারা কি অন্যের হক নষ্ট করেন?
(৭) আপনারা কি অবৈধ ইনকাম বা ব্যবসার সাথে জড়িত?
(৮) আপনারা কি টিভিতে আপত্তিকর মুভি বা অনুষ্ঠান দেখতে অভ্যস্ত?
(৯) আপনারা কি সন্তানদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন বা গায়ে হাত তুলেন?
(১০) আপনারা সন্তানদেরকে দিয়ে কি মিথ্যা কথা বলান?
(১১) আপনারা সন্তানদের সামনে কি শশুর-শাশুড়ীকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করেন?
(১২) আপনারা সন্তানদের সামনে কি সার্বক্ষণিক মোবাইল, ট্যব, ল্যাপটপ ইত্যাদি নিয়ে বসে থাকেন?
(১৩) আপনারা কি খাবার টেবিলে খাবার নিয়ে বাজে মন্তব্য করেন?

(১৪) আপনারা কি অপসংস্কৃতিগুলো বাসায় পালন করেন? এমন অনেক কাজ আপনাদের কারণে আপনাদের সন্তানের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। যা সন্তান শুধু আপনার থেকেই শিখছে। সন্তানকে সুসন্তান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে এ সব কাজ পরিহার করতে হবে।

মন্তব্য করার ক্ষেত্রে সংযমী হওয়া:

অনেক মা-বাবাই সন্তানদের প্রতি নানা রকম মন্তব্য করেন। এতে ছেলে-মেয়েদের মন ছোট হয়ে যায়। তারা নিজেরা অপমানিতবোধ করে কষ্ট পায়। তাদের নানা অপারগতা, দুষ্টোমি ও বিভিন্ন রকমের ভুলের জন্য আমাদের উচিত সুন্দর করে বুঝিয়ে বলা। ধমক দিয়ে দূরে সরিয়ে না দেয়া। হঠাৎ তাদের কোন প্রশ্নে, কোন কাজে বা পরীক্ষার সম্ভাব্য নাম্বার না পেলে আমরা এমন কিছু মন্তব্য করে বসি যা একদমই ঠিক নয়। এতে করে সন্তান এসব বাক্য নিজেরাও শিখে ফেলে এবং অন্যদের বলে বেড়ায়।

যুক্তরাষ্ট্রের চিলড্রেনস হসপিটাল অব উইসকনসিনের চিকিৎসক ডাক্তার কেনেথ এল গ্রিজেল তাঁর বৈজ্ঞানিক এক নিবন্ধে বলেন- 'কৈশোরে মানসিক অশান্তির অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে মা-বাবার কোনো বিষয় নিয়ে 'ঘ্যানঘ্যান' করা। সন্তানের প্রতি মা-বাবার এমন আচরণে ৯০ শতাংশ কিশোর-কিশোরী তাদের কৈশোরে কোনো না কোনো সময়ে মানসিক অবসাদ আর হতাশায় ভোগে।

চৌদ্দ থেকে একুশ বছরের শতকরা ৭৬ ভাগ মানুষই মা-বাবার খুঁতখুঁতে আচরণের কারণে মা-বাবার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে। এই বিরক্তির কারণে ৮০ শতাংশ সন্তানই বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে মাদকসহ বিভিন্ন অপরাধে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে।' যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব মেডিসিনের ইন্ডিয়ান জার্নাল অব সাইকিয়াট্রিতে এক তথ্যে বলা হয়েছে, প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে মানসিক অবসাদ আর হতাশার হার বেড়েই চলছে। ২০২০ সালের মধ্যে পৃথিবীতে মানসিক হতাশাগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ৫ দশমিক ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিম্নে সাধারণ কিছু ভুল বাক্য দেয়া হলো, যা আমরা বলে থাকি এবং যা বলা থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত;

১. তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না।

২. তুই একটা গাধা।

৩. তুই আস্ত একটা গর্দভ।

৪. তুমি একটা গরু/বলদ।
৫. তোর মাথা ভরা গোবর।
৬. তুই একটা ফালতু ছেলে/মেয়ে।
৭. তুই একটা অসভ্য।
৮. তুই একটা শয়তানের হাড্ডি।
৯. তোর চেয়ে অমুক অনেক ভালো।
১০. তুই না হইলেই ভালো হত।
১১. হওয়ার সময় মরে গেলে বাঁচতাম।
১২. তোর কারণে আমাদের জীবনটা শেষ।

এমন অনেক বাক্যই আমরা রাগবশত সন্তানদের বলে থাকি। রাগ শয়তানের বড় একটা ফাঁদ।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِندَ الْغَضَبِ"

অর্থ:"শক্তিশালী সেই ব্যক্তি নয় যে কুস্তিতে অপরকে পরাজিত করে, বরং, বরং প্রকৃত শক্তিশালী সে-ই, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।"সহিহ বুখারি:৬৮০৯

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা আলা বলেন,

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

বাংলা অনুবাদ:

যারা সুখে-দুঃখে ব্যয় করে, যারা রাগ সংবরণ করে এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।(সূরা আলে ইমরান:১৩৪)

এসব থেকে অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে, আমাদের এমন বাক্য থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখা উচিত।

মনোচিকিৎসক ও গবেষকরা সন্তানের সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্য সচেতন মা-বাবা হিসেবে সন্তানকে নিজের মতো একটু সময় দিয়ে তাকে সহযোগিতার মনোভাব দেখানোর দিকে গুরুত্ব দেন। সুতরাং আপনার সন্তানের সমস্যা, দ্বিধা-অস্বস্তি আপনাকেই প্রথমে বুঝতে হবে। এ জন্য সন্তানের সঙ্গে যতটা সম্ভব বন্ধুসুলভ আচরণ করার চেষ্টা করুন।অসৎ দিক বা ব্যর্থতার কথা সন্তানকে বারবার মনে করিয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকুন। এতে সন্তানের হতাশা আরো বেড়ে যায়। (সূত্র: ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, দ্য জাগল ও পাওনিয়ার উইমেন)

চাইলেই সবকিছু পাওয়া যায় না:

আপনার সন্তানকে 'অভাব' শেখান। আপনার প্রচুর সামর্থ্য থাকলেও আপনার সন্তানকে 'অভাব' শেখান। আপনি বাবা-এটিএম মেশিন না। আপনি মা-ঘষা দেয়া প্রদীপের দৈত্য নন। যে, সন্তান যখন যা চাইবে তা-ই উপস্থিত করবেন। সন্তান যা চাইবে তা-ই যদি দিয়ে দেন তাহলে আপনার সন্তানের 'মানুষ' হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। সন্তানকে জীবনের মানে বুঝানোর অর্থ কম ভালোবাসা না, বরং তাকে বেশী ভালোবাসা। কারণ আপনি যখন থাকবেন না, দুনিয়ার কঠিন পথে তাকে একা চলতে হবে। আপনার সন্তানকে এটা শেখান যে, 'চাইলেই সব কিছু পাওয়া যায় না'। সব কিছু পাওয়ার প্রয়োজনও নেই। কষ্টের মাধ্যমে অর্জিত জিনিসের মূল্য বোঝান। তাকে বোঝান সবকিছু ছাড়াও জীবন চলে। অভাবকে ভালোবাসতে হয়, তাতে অজ্ঞাতসারে স্বভাবটাও ভাল হয়।

লোকমান হাকিমের উপদেশ:

১। প্রিয় বৎস! কর্জ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে। কেননা তা দিনের বেলায় অপমান এবং রাত্রিতে দুশ্চিন্তার কারণ হয়।

২। প্রিয় বৎস! তুমি মোরগের চেয়ে বেশী অক্ষম হয়ো না। সেও তো শেষ রাতে জেগে উঠে চিৎকার শুরু করে। অথচ তুমি নিজ বিছানায় ঘুমে বিভোর থাকো।

৩। বেটা! গুরুত্ব দিয়ে জানাযায় অংশগ্রহণ হবে। অহেতুক অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকবে।

৪। হে বৎস! আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য অবলম্বন করবে।

৫। অন্যকে উপদেশ দেয়ার আগে নিজে আমল করার চেষ্টা করবে।

৬। নিজের মান-মর্যাদা বজায় রেখে কথা বলবে।

৭। ভাল মানুষরূপে বিবেচিত হওয়ার চেষ্টা করবে।

৮। স্বীয় অধিকারের প্রতি সচেতন থাকবে।

৯। গোপন তথ্য কারো নিকট প্রকাশ করবে না।

১০। বিপদে বন্ধুর পরীক্ষা নিবে।

১১। বন্ধুদের ভালোমন্দ উভয়টাই পরীক্ষা করবে।

১২। বিচক্ষণ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব গড়বে।

১৩। ভালকাজে পুণঃপুণঃ অংশগ্রহণ করবে।

১৪। নিজের কথা প্রমাণ করে দিবে।

১৫। বন্ধুদেরকে নিজ সাধ্যমত ভালবাসবে।

১৬। শত্রু বা মিত্র সকলের সাথেই হাসিমুখে সাক্ষাৎ করবে।

১৭। পিতা-মাতাকে সর্বাধিক সম্মান করবে।

১৮। শিষ্যকে সর্বাধিক মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখবে।

১৯। আয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্যয় করবে। এবং প্রত্যেক কাজে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে।

২০। কথা বলার সময় মুখ আয়ত্বের রাখবে।

২১। বীরত্বকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করবে।

২২। শরীর এবং পোষাক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে।

২৩। ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকবে।

২৪। প্রচলিত অস্ত্র-সস্ত্র ও যানবাহন পরিচালনা শিখে নিবে।

২৫। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদান করবে।

২৬। রাতের বেলায় যদি কথা বলার প্রয়োজন হয় তাহলে আস্তে এবং নরম স্বরে কথা বলবে।

২৭। দিনের বেলায় কথা বলার সময় চতুর্দিকে লক্ষ্য রেখে কথা বলবে।

২৮। কম কথা বলা, কম খাওয়া এবং কম ঘুমানোর অভ্যাস করবে।

২৯। নিজের জন্য যা পছন্দ করো না, তা অন্যের জন্য পছন্দ করবে না।

৩০। বিচক্ষণতা ও কৌশল অবলম্বন করে কাজ করবে।

৩১। উপযুক্ত শিক্ষিত না হয়ে অন্যকে শিখাতে যেও না।

৩২। অন্যের ধনসম্পদের প্রতি লক্ষ্য করবে না।

৩৩। নীতিহীনদের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা আশা করবে না।

৩৪। কোনো কাজেই চিন্তামুক্ত হবে না।

৩৫। যে কাজ তুমি করনি, এরূপ কাজ করেছ বলে মনে করবে না।

৩৬। আজকের কাজ আগামীকালের জন্য রেখে দিবে না।

৩৭। বড়দের সাথে হাসিঠাট্টা করতে যেও না।

৩৮। আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে অংশিদার সাব্যস্ত করো না।

৩৯। তোমার প্রতি যারা আশা রাখে, তাদেরকে নিরাশ করো না।

৪০। বড়দের সামনে কথা দীর্ঘায়িত করবে না।

৪১। অতীতের তিক্ততা মনে রেখো না।

৪২। নিজের ধন সম্পদের কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করবে না।

৪৩। সৎ লোকদের নিন্দা করবে না।

৪৪। আপনজনদের কাছ থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

৪৫। অহংকার করবে না।

৪৬। মানুষের সামনে দাঁত খেলাল করবে না।

৪৭। মানুষের সামনে মুখে বা নাকে অঙ্গুল প্রবেশ করাবে না।

৪৮। শব্দ করে থুথু ফেলবে না।

৪৯। হাই তোলার সময় মুখে হাত রাখবে।

৫০। কাউকে জনসম্মুখে লজ্জা দিবে না।

৫১। চোখ দ্বারা ইশারা করবে না।

৫২। এক কথা বারবার বলবে না।

৫৩। তামাশামূলক অবাস্তব কথা বলবে না।

৫৪। ঠাট্টা-বিদ্রুপ থেকে বিরত থাকবে।

৫৫। অন্যের সামনে নিজের প্রশংসা করবে না।

৫৬। মেয়েদের ন্যায় সাজসজ্জা করবে না।

৫৭। কথা বলার সময় হাত নাড়াচাড়া করবে না।

৫৮। আপনজনদের শত্রুর সাথে উঠাবসা করবে না।

৫৯। কারো মৃত্যুর পর তার সম্পর্কে অসৎ মন্তব্য করবে না।

৬০। যথাসম্ভব ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত থাকবে।

৬১। সৎলোকের প্রতি সুধারণা রাখবে।

৬২। নিজের খানা অন্যের দস্তরখানায় নিয়ে যাবে না।

৬৩। কোনো কাজেই তাড়াহুড়া করবে না।

৬৪। পার্থিব স্বার্থের মোহে নিজেকে দুঃখ-কষ্টে ফেলবে না।

৬৫। রাগান্বিত অবস্থাতেও ধীর ও শান্তভাবে কথা বলবে।

৬৬। জামার হাতা দ্বারা নাক পরিষ্কার করবে না।

৬৭। সূর্য উদয়ের পূর্বেই শয্যা ত্যাগ করবে।

৬৮। পথ চলার সময় বড়দের আগে চলবে না।

৬৯। এদিক সেদিক উকিঁ মেরে দেখবে না।

৭০। অন্যের কথার মধ্যে বাঁধা দিয়ে কথা বলবে না।

৭১। মেহমানের সামনে কারো প্রতি রাগান্বিত হয়ো না।৭২। সন্দেহ প্রবণতা ত্যাগ করতে না পারলে দুনিয়ায় তুমি কোনো বন্ধু খুঁজে পাবে না।

৭৩। বেটা! তুমি এত মিষ্ট হয়ো না যে, মানুষ তোমাকে গিলে ফেলে। আর এতো তিক্তও হয়ো না যে, মানুষ তোমাকে থুথুর মতো ফেলে দেয়।

৭৪। বেটা! নিজের খানা আল্লাহভীরু লোকদের ব্যতীত কাউকে খাওয়াবে না। আর নিজ কাজের জন্য আলেমগণের নিকট হতে পরামর্শ নিতে থাকবে।
৭৫। বেটা! মূর্খের সাথে বন্ধুত্ব করো না। এমন যেন না হয় যে, তার মূর্খতাসুলভ কথাবার্তা তোমার ভালো লাগতে আরম্ভ করে। আর জ্ঞানী লোকের সহিত শত্রুতা করো না। এমন যেন না হয় যে, সে তোমার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে রাখে।
৭৬। বেটা! তুমি সেদিন থেকে প্রতিনিয়ত আখেরাতের দিকে ধাবিত হচ্ছো, যেদিন তোমার দুনিয়াতে আগমন ঘটেছে। লোকমান হেকিমের উপদেশাবলী।
৭৭.কোনো নফল ইবাদত যদি ফরজ কাজে ব্যাঘাত ঘটায় তাহলে সে নফল সযত্নে পরিত্যাগ করবে।
আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে উক্ত নাসিহাগুলোর উপর আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন!

হাত্বান ইবনু মুয়াল্লার নাসিহা:

হাত্বান ইবনু মুয়াল্লা নিজ ছেলেদেরকে নাসিহাহ করেছিলেন। এখানে তার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো।
১. বেটা! আল্লাহকে ভয় করে চলবে। তার আনুগত্যকে নিজের উপর আবশ্যক করে নাও।
২. সুন্নাতের অনুসরণ কর। নিষিদ্ধ করজ থেকে বিরত থাকো। যেন তোমার জীবন সুন্দর হয় এবং চক্ষু শীতল হয়।

৩. আল্লাহ তাআলার কাছে কোন জিনিস গোপন নেই। আমি তোমাকে কয়েকটি বিষয়ের আদেশ করছি। তুমি যদি সেগুলো বুঝে করো, তোমার জীবন সুখময় হবে।
৪. নিজ পিতার আনুগত্য কর। তার দেয়া উপদেশের উপর আমল করো।
৫. অনর্থক কথা-বার্তা বলা থেকে বিরত থাকো।
৬. অতিরিক্ত হাসি বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা এগুলো মানুষের গম্ভীরভাব নষ্ট করে দেয়। কৃপণতা সৃষ্টি করে।
৭. সব লেনদেনের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বণ করবে। মধ্যমপন্থা হলো সর্বোত্তম পথ।
৮. কম কথা বলো।
৯. পরস্পরের মাঝে সালামের প্রথা চালু কর।
১০. নেক লোকদের সাদৃশ্যতা অবলম্বণ কর।

১১. অসৎ লোকদের সংশ্রব থেকে বেঁচে থাক। কেননা তারা নিজ বন্ধুর সাথে খেয়ানত করে।
১২. ভাই দুই ধরনের হয়ে থাকে। এক. যে বিপদের সময় তোমার পাশে থাকবে। দুই. যে সুখের সময় তোমার বন্ধু হবে।

(ফুটিয়ে তুলুন সুবাসিত ফুল: সাওয়ান বিনতে মোস্তফা বুখাইত)